

তৃতীয় অধ্যায়

শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ

মানুষ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই গল্প বলতে ও শুনতে শুরু করেছে। যদিও উনিশ শতকের ছোটগল্পের জন্মের কারণ হিসেবে প্রথমত যন্ত্রণার কথা জানা যায় অর্থাৎ বলা বাহুল্য যন্ত্রণা থেকেই ছোটগল্পের জন্ম। তাই ছোটগল্পকে যন্ত্রণার ফসল বলা হয়। এই যন্ত্রণা দ্বিবিধ। এক. সামাজিক সংকট দুই. ব্যক্তিক। একে আবার বলা যেতে পারে আত্মিক কারণ। এছাড়াও অন্য একটি কারণ হ'ল—সংবাদপত্র। ছোটগল্পের জন্মের পেছনে পত্রিকার আনুকূল্য স্বীকার করতেই হয়। অতীতে গল্প বলার মধ্যে দিয়ে আদি মানুষ অভিজ্ঞতার বিনিময় করেছে। গুহার মধ্যে আগুনের ধারে বসে একে অপরের সঙ্গে শিকার করার অভিজ্ঞতা বিষয় বিনিময় করেছে। পথ চলার অভিজ্ঞতা, পথের বিপদ, পশুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়, শিকার করার কৌশল বর্ণনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছে। সেই হ'ল গল্পের আরম্ভ। তারপর কালে কালে বৌদ্ধজাতক, রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত গদ্য আখ্যানাবলী ও প্রাকৃত গল্প সাহিত্য ভারতীয় কথা ও আখ্যায়িকা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে। সেকালে উদয়ন কথা নিয়ে গ্রাম-বৃদ্ধেরা যে গল্প বলতেন তারও বিশেষ খ্যাতি শোনা যায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালির নিজস্ব গল্প ভাণ্ডার। পঞ্চদশ থেকে আষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ। সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি বিষয় ছিল মঙ্গলকাব্যগুলির মূল আলোচ্য বিষয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন, রীতি-নীতি, সংস্কার, বিশ্বাস, রাষ্ট্রিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট ও ধর্মীয় সংঘাত ও সমন্বয়ের চিত্রগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে রূপ পেয়েছে এই ধরণের গ্রন্থগুলিতে। বলাবাহুল্য যে, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালির জাতীয় সম্পদ। সর্বোপরি আমরা মধ্যযুগীয় বাংলা ও বাঙালির পরিচয় এই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকে আশ্রয় করেই জানতে পাই। এই দীর্ঘ সময় অতিক্রমণের পর উনিশ শতকে আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাত। সবশেষে আধুনিক যুগে কালক্রমে কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্বে গল্প উপন্যাসের কথা জানা যায়। শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু গল্প রচনা করেছিলেন। সেই সমস্ত গল্পে মূলত পুরাকীর্তি তথা ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে শশিচন্দ্র দত্তের পস্থানুসরণ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) বাংলায় প্রথম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) রচনা করেন।

‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’-এর মধ্যে ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ এই দুটি আখ্যান-বৃত্ত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) হাতেই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে রোমান্স ধর্মিতাই লক্ষণীয়। তারপর রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনা করলেন। বলা যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতেই বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস ধরা দিয়েছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৩২-১৯৩৮), যদুনাথ ভট্টাচার্য ইতিহাসকে নিয়ে বাংলা গল্প উপন্যাসের জগতে হাজির হলেন। যদুনাথ ভট্টাচার্য বাংলার ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে খুব একটা সমাদর পায়নি পাঠক সমাজের কাছে। অতঃপর এলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০)। ইতিহাসের অনুষঙ্গ, বিষয়-বস্তু, চরিত্র প্রভৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেও পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁর কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি একজন ইতিহাস গবেষক। ফলত ইতিহাসকে তিনি ধারাবাহিক বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সম্মত রূপদান করতে পেরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে ‘ঐতিহাসিক রস’ বঙ্কিম অনুসারী। ইতিহাসের বর্ণনায়, কল্পনায় তিনি কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। এই সময়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে হাজির হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দুবাবু ইতিহাসের গবেষক ছিলেন না। ভারতের ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেও অন্যান্য ইতিহাস-গবেষকের মতো তিনি ইতিহাসানুসন্ধান করেননি। বলা যায়, তিনি একজন ইতিহাস বিষয়ের অনুরক্ত পাঠক। নিবিড় ইতিহাস অনুশীলনের ফলেই এই সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্পের কালসীমা। তাঁর লেখায় ইতিহাস স্বচ্ছন্দগতিতে রসসৃষ্টিতে অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছে। ইতিহাস ও কল্পনা তাঁর ঐতিহাসিক আখ্যান বৃত্তে হাত ধরাধরি করে চলেছে। ফলত গল্পের তীক্ষ্ণতা আরও তীব্রতর ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় — “দূরের দৃশ্যপটকে নিকটে এনে দূরের মানুষকে কাছের মানুষ করতে পেরেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এইখানেই ঐতিহাসিক গল্প লেখক রূপে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।”

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি মূলত বিশেষ বিশেষ সময়সীমায় আবদ্ধ। তিনি মূলত সতেরোটি ‘ইতিহাস-নির্ভর’ গল্প রচনা করেছেন। গল্পগুলিতে তিনি বিশেষ এক সময়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিত্র এঁকেছেন। দূরকালে বিসর্পিত মানব সত্তাকে স্থাপন করে বর্তমানকালের সঙ্গে কোন এক অদৃশ্য সেতুর মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত ‘ইতিহাস-মূলক’ গল্প।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে আলাউদ্দিন খিলজির সময় পর্বে লেখা ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ ও ‘বেরা রোধসি’। শিবাজীকে নিয়ে তিনি ‘বাঘের বাচ্চা’ নামক গল্পটি রচনা করেছেন। ‘তক্ত্ মোবারক’ গল্পটি শাহসুজার আমলে রচিত হয়েছে। বলা যায়, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘চুয়াচন্দন’ এই দু’টি গল্পের পটভূমি মূলত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কল্পিত। ‘মুৎপ্রদীপ’, ‘অষ্টম সর্গ’, ‘মরু ও সঙঘ’ — গল্প তিনটি চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে রচিত। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’ ও ‘সেতু’ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীর কাল সীমায় রচিত। ‘প্রাগজ্যোতিষ’ গল্পটির কালসীমা আর্যদের আগমনের গোড়ার দিকে। ‘ইন্দ্রতুলক’ -এর সময় সীমা আর্যদের আগমনেরও পূর্বে। ‘রুমাহরণ’ গল্পটির কাল প্রাচীন তবে অনির্দেশ্য অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের পটভূমিতে রচিত। ‘আদিম’ গল্পটির বীজ মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে পাওয়া। ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পটির পটভূমি মূলত বৌদ্ধযুগ। উল্লিখিত গল্পগুলির কালসীমা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে ইতিহাসের পটভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে—লেখকের রচনা কালের ওপর ভিত্তি করে নয়।

বলা যায়, সুদূর অতীতের কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে শরদিন্দুবাবু গল্পগুলির পটভূমিকা রচনা করেছেন। গল্পের মধ্যেও গল্প বর্তমান — শরদিন্দুবাবুর কিছু কিছু গল্পের ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিকে দু’টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি। যথা—

১. জাতিস্মর-প্রসঙ্গমূলক গল্পধারা
২. ইতিহাসাশ্রিত গল্পধারা।

দু’টি বিভাগেই বহুদূর কালের ইতিহাসের অনুষঙ্গ, ঘটনা, চরিত্র এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আবহ জড়িয়ে রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ইতিহাসাশ্রিত জাতিস্মর-প্রসঙ্গমূলক গল্পগুলির কথাবৃত্তে গল্পের মধ্যে গল্প বিদ্যমান। দ্বিতীয় ধারার গল্পগুলি অতীত ইতিহাসের ঘূর্ণায়মান ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ণিত। এই অধ্যায়ে জাতিস্মর ধারার গল্পগুলির সুবিস্তৃত আলোচনার পাশাপাশি ইতিহাসাশ্রিত গল্প ‘ইন্দ্রতুলক’, ‘প্রাগজ্যোতিষ’, ‘আদিম’, ‘অষ্টম সর্গ’, ‘মরু ও সঙঘ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘বেরা রোধসি’, ‘চুয়াচন্দন’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘তক্ত্ মোবারক’ এবং ‘চন্দন-মূর্তি’ প্রভৃতি বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতিহাস মূলক গল্প বা উপন্যাসে ইতিহাসকে অবিকল ভাবে উপস্থাপিত করা হয় না। অতীতের কোনো ঘটনা ইতিহাস লেখকের মতো ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করাও নয়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে তুল্যমূল্য বিচার করে খাঁটি ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন। তথ্যের বিকৃতি তাঁর কাজের মূল্য হ্রাস করে। ঔপন্যাসিক মনে করেন ইতিহাস হ’ল বর্তমান ও অতীতের মধ্যে অস্তহীন সংলাপ। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশের হাতিয়ার। কারণ, ইতিহাসে মানুষ খুঁজে পায় নিজের অস্তিত্ব। ইতিহাস মানুষের পূর্বপুরুষের বীরত্ব, মহিমা, শৌর্য, দেশানুরাগ, জাতীয় ঐক্য, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বর্তমানকালের মানুষকে স্মরণ করায়।

ইতিহাস পাঠে মানুষ জাতীয় গৌরব সম্পর্কে অবহিত ও উজ্জীবিত হন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজটিই কিন্তু ইতিহাস অনুষঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে করেছেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—“বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই। আমাদের ইতিহাস আছে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আছে, কিন্তু আমরা তাহা প্রাক-মুসলমান যুগের ইতিহাস। সেই ইতিহাস বাঙালীকে শুনাইতে পারিলে বাঙালীর আত্মচৈতন্য জন্মিতে পারে।”^{২২} অর্থাৎ কে বলেছেন বাঙালির ইতিহাস নেই।

শরদিন্দুর মতে ইতিহাস বলতে পূর্বপুরুষদের গৌরব কাহিনিকেও বোঝায়। তাই তিনি একই সঙ্গে বর্তমান কালের মানুষকে পূর্বপুরুষের গৌরব ও আত্মচৈতন্য জাগাতে ইতিহাসকে অবলম্বন করে ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। বলা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসকে গল্পে রূপায়িত করেছেন। তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে কীভাবে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো। বলাবাছল্য যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশানুরাগের কথা মনে করায়। ইতিহাস অনুসন্ধান ও ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—‘বাঙালীর ইতিহাস চাই।’ আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ কাজটিই করেছেন। বাঙালি সমাজকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে বাঙালির জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল রূপ দেন—যা বাঙালি জাতির কাছে অত্যন্ত জরুরি। এই সতেরোটি গল্প ইতিহাসের সময়সীমার নিরিখে তথা কাল-পরম্পরায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। সেদিক থেকে ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটি প্রথমেই আলোচনার দাবি রাখে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শাদাপৃথিবী’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটি। ‘শাদা পৃথিবী’ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন — “ইন্দ্রতুলক রচনাটি কেহ গান্ধীর্ষের সহিত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করি না। উহা ‘হইলে হইতে পারিত’ গোছের পরিকল্পনা; কিন্তু জ্ঞাত ইতিহাসের সহিত তাহার কোনো বিরোধ নাই। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল এই ঐতিহাসিক তর্কের মীমাংসা হয় নাই। আর্যগণ যুরোপের আদিম অধিবাসী ছিলেন ইহা যেমন সাহেবদের আঘাতে গল্প, আমাদের গল্প হয়তো ততটাই আঘাতে, তাহার বেশী নয়।”^{২৩}

কথোপকথনের ভঙ্গিতে আরম্ভ ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটি। গল্পে বর্ণিত ইতিহাসের পণ্ডিত স্বপ্নে আটহাজার বছর পূর্বকার পুরনো ইতিহাস চোখের সম্মুখে দেখতে পেয়েছেন। স্মর্তব্য, এই গল্পটিতে স্বপ্ন প্রসঙ্গ থাকলেও ‘সেতু’ গল্পটির মত নয়। আলোচ্য ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটির মধ্যে একজন ইতিহাসের পণ্ডিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার ইতিহাস দেখতে পেয়েছেন স্বপ্ন-যোগের মধ্যে দিয়ে।

প্রাক-ইতিহাসের অনেক কথাই আমাদের অজ্ঞাত। সেই অতীতের অন্ধকারকে অপসৃত করে তার ভিতরের মানব জীবনকথাকে আমাদের কাছে উপস্থিত করবার দায়িত্ব নৃতাত্ত্বিকের, প্রত্নতত্ত্ববিদের, সমাজতত্ত্বের গবেষকের। তাঁদের গবেষণায় যে তথ্য সঞ্চয় হয় সাহিত্যকারের পক্ষে তাই প্রাথমিক উপাদান। সাহিত্যকারের নিজস্ব গবেষণায় প্রাগৈতিহাসের অন্তর্লোকে আলোক সম্পাত হয় না। কিন্তু গবেষণা নয় তার সুতীর এবং অন্তর্ভেদী কল্পনাশক্তির আলোকে সেই অতীতের অন্ধকার অপনোদন করে তার অন্তর্বস্তুকে তিনি উদ্ঘাটিত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের কিন্তু পদ্ধতি কল্পনাচারী। অতীতের জীবন লেখককে নানা কারণে আকর্ষণ করে। প্রথমত তাঁর রোমান্সের প্রতি আকর্ষণ। অতীতের এই আকর্ষণ কালে কালে বহু কবি সাহিত্যিকে আকৃষ্ট করেছে। স্কট তার উদাহরণ কোলরীজ তার উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র তার দৃষ্টান্ত স্থল। শরদিন্দুর অতীত চারিতার একটি বড় কারণ এই রোমান্সের আশ্চর্য জগৎ রচনা। অতীত আমাদের বর্তমান জীবনের নানা ক্লিন্নতা থেকে কদর্যতা ও তুচ্ছতা থেকে মুক্ত হয়ে কল্পলোকের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় স্বপ্নে তাকে অনুভব করেছেন, প্রবন্ধে (মেঘদূত) তার কল্পনার দ্বারা নিকষে কণকরেখার মতো আলোকিত করবার কথা বলেছেন। রোমান্সপ্রিয়তা এবং ধূলি মলিনতা মুক্ত এক নির্মল জীবন কাহিনির প্রতি আকর্ষণ কল্পনা প্রবণ কবি সাহিত্যিকদের ধর্ম। তার সঙ্গে আছে দূরচারী অতীতের জীবন কাহিনির পুনর্নির্মাণ। যাকে ইতিহাসের দু-চারটা বড় বড় তথ্যের দ্বারা মাত্র জানা যায়, যার জীবনযাত্রার কোনো স্পষ্ট পরিচয় জানা নেই সেই ইতিহাস ভূমির অল্প জানা ঘটনাবলীর কঙ্কালের উপর রক্ত মাংসের সঞ্চারণ করে সে সময়কার মানব জীবনের সম্ভাব্যরূপটি গড়ে তোলা কবি কল্পনার কাজ। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বা গল্পগুলিতে এই জীবনের সম্ভাব্য রূপটি কল্পনায় নির্মাণ করবার চেষ্টা দেখা যায়। বঙ্কিমের ইতিহাস অনুসরণের মূলে সৌন্দর্যও প্রেম চেতনা প্রথমদিকে প্রধান থাকলেও তিনি ক্রমশ দেশ ও জাতির মহত্ত্ব সন্ধান করতে অগ্রসর হয়ে গেছেন। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত জীবন রচনার মূলে কোনো স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা প্রবল নয়, বরং কল্পনামূলক অতীতের পুনর্নির্মাণই প্রধান লক্ষ্য।

তিনি একজন নৃতাত্ত্বিক গবেষকের দৃষ্টি ভঙ্গিতে ‘বর্বর মানব জাতি’র উৎস ভূমির নিরন্তর অনুসন্ধান করেছিলেন। বর্বরতার যুগের মানবসভ্যতাই কী পরবর্তীকালে ‘আর্য সভ্যতায়’ পরিণত হয়েছিল, না যুরোপের ক্ষেত্রভূমি থেকে আর্যরা আমাদের দেশের অভিমুখে এসেছিল — লেখকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়েছিল — আর তারই ফলস্বরূপ আলোচ্য ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটির অবতারণা। লেখক মনে করেন আর্যরা মূলত ভারতেরই আদিম অধিবাসী। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ও

ভারতীয় পণ্ডিতদের একাংশ মনে করেন আর্যরা যুরোপের অধিবাসী — এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব গল্পটির কাহিনি-অগ্রসর হয়েছে। আর্যদের বাসস্থান, আচার-আচরণ, জীবিকা, অন্নসংস্থান, পশুপালন, কৃষিকাজ, দূরদর্শিতার পরিচয় ও সাংসারিক জীবন পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে। আর্যদের দেবতা হিসেবে ‘মৎস্য’, ‘বিবস্বান’ ও পরবর্তীকালে ‘বরুণ’ দেবতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে লেখক যদি সচেতন ভাবে গবেষণা না করতেন তাহলে বর্বরতার যুগে সকল জাতিরই একটা 'Totem' বা ‘কুলদেবতা’ থাকতো — এ সব তথ্য উঠে আসতো না। লোকসংস্কৃতির তুচ্ছ অনুসঙ্গকেও লেখক তাঁর রচনার মধ্যে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে ছাড়েন নি। অতপর আর্যদের ক্রম-বিবর্তন, ঘোড়ার ব্যবহার, আর্যদের দেবতা ‘বরুণ’কে সরিয়ে ‘ইন্দ্র’কে পূজার্চনা, ইন্দ্রের দেবত্ব লাভ সর্বোপরি আর্যদের এক নোতুন সংস্কৃতির জন্ম লাভ ইত্যাদি প্রসঙ্গ গল্পটিতে উঠে এসেছে। লেখকের কথায় — “দেশটা ইন্দ্রের দেশ বলে পরিচিত হল; প্রাচীন দেশ অবশ্য বরুণের দেশই রইল। ইন্দ্রের দেশে যারা বাস করতে লাগল, তাদের নাম হল ইন্দ্র। কালক্রমে ইন্দ্র অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়াল হিন্দু। এখনও সেই নাম চলে আসছে। আমরা হিন্দু অর্থাৎ ইন্দ্রপূজক।” -এরপর সগর রাজার একপুত্র ভগীরথ ষাট হাজার প্রজা নিয়ে কোনো এক কারণে ভারত-অভিযান চালিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অযোধ্যায় এসে পড়েছেন। রামচন্দ্র হলেন সগর রাজার নবম অধস্তন পুরুষ। ভারতবর্ষেরই অধিবাসী। এভাবেই গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

‘জাতিস্মর’ (১৩৩৯) প্রথম গল্প-গ্রন্থ তাঁর। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পূর্বজন্মের কাহিনি নিয়ে লেখা তিনটি গল্পের সমষ্টি। এই তিনটি গল্প হ’ল — ‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’ ও ‘রুমাহরণ’। এছাড়া আরও তিনটি গল্পের নাম করা যায় — ‘চুয়াচন্দন’ গ্রন্থের (১৩৪২) ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘বিষকন্যা’ গ্রন্থের (১৩৪৭) ‘সেতু’ এবং ‘বিষকন্যা’ ও জাতিস্মর-মূলক গল্পধারার অন্তর্ভুক্ত। জাতিস্মরধারার গল্পগুলি মুখ্যত হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের পটে রচিত। এ গল্পগুলিতে অতীত যুগের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনে, তৎসম শব্দবহুল ভাষার ব্যবহারে সৌন্দর্য রচনা ও রস সৃষ্টিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণির একটি রচনা ‘রুমাহরণ’। আর এই গল্পটির পটভূমি ঐতিহাসিক যুগের। গল্পের কথক বলেছে সন-তারিখের ব্যবহার তখনও আরম্ভ হয়নি। মানুষ তখন বর্বর ও বন্য; প্রকৃতির সঙ্গে, পশুর সঙ্গে অহরহ লড়াই সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করতো। পশুর কাঁচা মাংস খেতো। নারীহরণ, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাদখল ও আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি সেসময়কার মানুষের অভীষ্ট ছিল।

‘রুমাহরণ’ গল্পটি পুরুষ ও নারীর জন্মান্তরের স্মৃতি-সূত্রে রচিত। তার মূল বিষয়

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পটভূমিতে রচিত আদিম কামনা এবং নারীহরণ গল্পটির মূল বিষয়। সেকালে জোর করে কোনো গোষ্ঠীর ভিতর থেকে নারীদের অপহরণ করে এনে সঙ্গিনী হিসেবে ব্যবহার করার রীতি ছিল। ফলস্বরূপ নারীর সংখ্যা কমে যাওয়ার চিন্তায় পুরুষরা ছিল চিন্তিত। শরদিন্দু সেই আদিম যুগের গোষ্ঠীজীবনের পটভূমিতে নারীহরণের প্রাচীন আখ্যানকে কল্পনায় সজীব করে তুলেছেন। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’ ও ‘মুৎপ্রদীপে’ পাই শুধু নায়ক চরিত্রের জন্মান্তর প্রসঙ্গ, কিন্তু ‘রুমাহরণ’ গল্পটিতে লেখক নায়ক-নায়িকা উভয় চরিত্রের জন্মান্তর স্মৃতি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রেলের পাশ পেয়ে কথক তথা নায়ক শৈলপ্রদেশে বেড়াতে যান। সেখানে “শীতশিহরিত তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতি” গভীর রাত্রিতে তাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়। সে একাকী চন্দ্রালোকিত পাইন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির “এ দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে।” যেন এই দৃশ্যপটটিকে অতীত যুগ থেকে ছিঁড়ে এনে এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতে তার ঘুম আসছিল না বলে রাস্তায় বেরিয়ে এক পাইন গাছের তলায় বসে রাত্রির শোভা নিরীক্ষণ করছিল। আর সেই সময় একটি ক্ষীণ মধুর কণ্ঠস্বর তার কানে বাজে। সঞ্চরমান ছায়ামূর্তির মতো কেউ সে গান গাইছিল। গানের কথাগুলি কথক বুঝতে পারে নি, কিন্তু সুরটি যেন তার বহুকালের কোনো চেনা সুর যেন আগে কোথায় এ সুর সে শুনেছে। আর সেই মুহূর্তে কথকের পূর্ব জন্মের স্মৃতি জেগে ওঠে। “এই গান এই কণ্ঠে গীত হইতে আমি পূর্বে শুনিয়াছি — বহুবাব শুনিয়াছি। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ আমার কাছে পুরাতন। কিন্তু তফাৎ এই যে, যে-ভাষায় এই গান পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহা বাংলা ভাষা নহে। সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গান ভুলি নাই। কোথায় অন্তরের নির্জন কন্দরে এতকাল লুকাইয়াছিল, শুনিবামাত্র প্রতিধ্বনির মতো জাগিয়া উঠিল।” যে গান শুনে কথকের জন্মান্তরের স্মৃতি জেগে উঠেছে, সে গান শোনা মাত্রই তাঁর বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠত — তা নিম্নরূপ :

“বনের চিতা মেরেছে মোর স্বামী

ধারালো তীর হেনে!

চামড়া তাহার আমায় দেবে এনে

পরবো গায়ে আমি।”

অর্থাৎ, গানটিতে ধরা পড়ে একটি নারীর স্বামী শিকার করতে কতটা দক্ষ, কতটা বীর, কতটা কঠিন শিলার মতো দেহ তার বর্ণনা। পাশাপাশি শিকার করা পশু-পাখির চামড়া অলঙ্কার হিসেবে পরবার কথাও জানা যায়।

আদিম মানব সমাজের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে এই গানটির কথাগুলিতে। আর

সেই সূত্রে কথক পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়ে অতীতের কাহিনি বলতে শুরু করেছে। সে এক আদিম সমাজের মানুষ। তার সমকক্ষ প্রতিনায়ক হুড়া। গাঙ্কার ধারণা ছিল এই সমাজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারী তিভ্তি তাকে বিয়ে করবে। তাদের গোষ্ঠীতে মেয়েদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। সেজন্য সব পুরুষের সহযোগী নারী পাওয়া যাচ্ছিল না। যারা বলশালী তারা অন্যকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত করেই সহচরী যোগাড় করে নেয়। গাঙ্কাকে তিভ্তি কিন্তু পছন্দ করেনি, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হুড়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। নারীর অধিকার লাভের যুদ্ধ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আদিম দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত গাঙ্কার পালিয়ে যাওয়ার ফলে শেষ হয়।

গাঙ্কা পালিয়ে গিয়ে এক নির্জন গুহায় আশ্রয় নেয়। সেখানে সে নির্বিঘ্নেই ছিল। এরই মধ্যে সেই পথ দিয়ে নতুন এক মানবগোষ্ঠী পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমি অংশে এসে বাসা বাঁধে। তখনকার মানুষ যাযাবর প্রকৃতির। তাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। গাঙ্কার নিজের কথায় — “একটা অশ্রুতপূর্ব চিহ্ন-চিহ্ন শব্দে চোখ তুলিয়া উপত্যকার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে একেবারে নিষ্পন্দ হইয়া গেলাম। এ কি ! দেখিলাম, পাহাড়-দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো একাজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।”

অনেক কুমারী, সুন্দরী যুবতী সে দলে ছিল। গাঙ্কা গোপনে ঐ মানুষদের গতিবিধি লক্ষ করে। একটি সুন্দরী মেয়েকে সে কেড়ে নিতে চায়; নিজের গোষ্ঠীর যুবকদের নিয়ে রাত্রে সে চড়াও হয়। যুদ্ধে বহু মানুষ মারা যায়। গাঙ্কা তার পছন্দের মেয়েটিকে হরণ করে আনে।

সেকালের আদিম সমাজে প্রচলিত বিবাহ প্রথা এই কাহিনিটির পিছনে লুকিয়ে রয়েছে। অন্য গোষ্ঠী থেকে মেয়েদের অপহরণ করে এনে তাকে সহচরী হিসেবে গ্রহণ করা হত। আদিম বিবাহ ব্যবস্থার এই ভিত্তিটুকুই এ কাহিনির ইতিহাস। বাকী সবটাই লেখকের কল্পিত। কিন্তু সে কল্পনা ইতিহাসের প্রকৃতিতে কোথাও অতিক্রম করে নি বা ক্ষুণ্ণ করে নি। নীরব ইতিহাস কল্পনার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু ইতিহাসের এই অস্পষ্ট ধূসর অঙ্ককারকে কল্পনার পাত্র-পাত্রীর জীবনালোকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তার ইতিহাস নির্ভর কাহিনিগুলিতে রোমান্সের জয়জয়কার; সে রোমান্স ইতিহাস অতিচারী নয় ইতিহাস অভিমুখী।

গল্পটি কথকের পূর্ব জীবনের বৃত্তান্ত অর্থাৎ ধূসর অতীতের মোহময় ইতিবৃত্ত। কিন্তু বহুদূরকালের স্মৃতিসূত্র বর্তমানের সীমারেখায় ধরা দিয়েছে অপূর্ব ভঙ্গিতে। লেখকের বর্ণনায় তা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে — “মনে পড়ে না? সেই উপত্যকায় তোমরা একদল যাযাবর এসে ছিলে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া উট ছিল, তোমরা আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ করে খেতে। হুদের জলে যে

লম্বা ঘাস জন্মাতো, তার শস্য থেকে চাল তৈরি করতে তুমিই যে আমায় শিখিয়েছিলে।... মনে পড়ে না? একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমরা তোমাদের আক্রমণ করলুম। তোমাদের দলের সব পুরুষ মরে গেল! তোমাকে নিয়ে আমি যখন পালাচ্ছিলুম, তুমি লোহার ছুরি দিয়ে আমার কপালে ঠিক এই খানে মারলে।” গাঙ্গা রুমাকে পূর্বস্মৃতি স্মরণ করানোর চেষ্টা করেছে। রুমাকে দেখতে পেয়ে গাঙ্গা হৃদয় দিয়ে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দিয়ে রুমাকে কাছে পেতে চেয়েছে — কিন্তু রুমা — “বলিল, মনে পড়ে না — কবে কোথায় —” পর মুহূর্তেই গাঙ্গার কপালের দাগ দেখে রুমার পূর্বজনমের স্মৃতি ফিরে এসেছে — “বহু পূর্বজন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য বিধানে ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জডুলরূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে! রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষনেত্র চাহিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, গাঙ্গা! গাঙ্গা!”

এভাবেই গাঙ্গা ও রুমার পূর্বস্মৃতির আলোকে লেখক অতীতকে আলোকিত করে তুলেছেন। এই গল্পটি পাঠে পাঠকের মনে অনন্ত বিস্ময়ের উদ্বেক করে ও গল্পের আদ্যন্ত কৌতূহল বজায় রাখে (ঘটনার প্রবহমানতার সঙ্গে পাঠকের মনেও অতীত)। অন্বেষণের অসীম আগ্রহ জাগায়। লেখকের কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণ তথা সুদূর প্রসারী অতীতের অন্ধকার ভেদ করবার মতো মানবসভ্যতার অতীত খনন করে তার পরিচয় উদ্ধার করবার মতো কল্পনাশক্তি— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল। ‘রুমাহরণ’ গল্পটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। নারী পুরুষের আকর্ষণ বিকর্ষণের বিচিত্র চিত্তবৃত্তির সফলতম রূপকার হিশেবেও তিনি কৃতিত্বের দাবী রাখেন। মানব-হৃদয়ের কামনা বাসনা প্রেম ও বৈরিতার বহু মুখী প্রবৃত্তিকেও তিনি বাস্তব সম্মত রূপ দান করেছেন।

রুমাকে গাঙ্গা পাশবিক ভাবেই ছিনিয়ে নিয়েছিল, ধ্বংস করে দিয়েছিল তার গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাসকারী মানুষগুলিকে। তাদের নারীদের হরণ করে নিয়েছিল এই গোষ্ঠীর পুরুষেরা। রুমা এখানে কোনো বিশেষ একটি নারীর রূপ নয়; আদিম সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের প্রবৃত্তিগত আকর্ষণের একটি ছবি তাকে অবলম্বন করে আঁকা হয়েছে। এই রকম নারীহরণ সেকালের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খুব স্বাভাবিক ছিল। পুরুষকে শক্তি সাহস ও শৌর্যের দ্বারা নিজের সঙ্গিনী নির্বাচন করতে হত। অনেক সময় গোষ্ঠীর ভিতরের কোনো নারী এই পুরুষের সঙ্গিনী হত। কিন্তু সঙ্গিনী স্বেচ্ছায় পুরুষ নির্বাচন করলেও গোষ্ঠীর অন্য সক্ষম যুবকেরা তাকে আক্রমণ করত। আবার বহুক্ষেত্রে অন্য গোষ্ঠীর নারীকে হরণ করে আনতে হত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলিতে প্রাচীনকালের সমাজ ও সংস্কৃতির একটি ভাবঘন রূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যে যুগের ইতিহাস ধূসর অতীতের প্রাস্তলগ্ন, যার কোনো তথ্য সম্মত পরিচয় পাওয়া যায় না, সেখানে

অতি সামান্য কোনো উপাদানের সাহায্যে কল্পনাকে প্রসারিত করে জীবনের রূপকে ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা তাঁর ছিল। ঐতিহাসিকেরা প্রাগৈতিহাসের যে পর্বের পরিচয় জানতে প্রত্নবস্তুর উপর সাহায্য নেন— একটি দুটি উপকরণের ভিত্তিতে যার উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেন—সাহিত্যকার সেখানে সেই সামান্য উপকরণের ভিত্তিতে কল্পনার ইন্দ্রজাল প্রসারিত করে অতীতের জীবন ও সংস্কৃতিকে বিশ্বাস্য যোগ্য করে গড়ে তোলেন। ভাষা তাত্ত্বিকেরা ‘বিবাহ’ শব্দটির মধ্যে প্রাচীন কালে নারী হরণের ইতিহাস খুঁজে পান। রামেশ্বর শ’ লিখেছেন— ‘বিবাহ’ শব্দের মূল অর্থ বিশেষ রূপে বহন করা। এ থেকে কোনো কোনো সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন অতীতে বিবাহ যোগ্য কন্যাকে অপহরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। ‘বিবাহ’ শব্দের মূল অর্থের মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে।’ শরদিন্দু এই শব্দার্থের ইঙ্গিত টুকু মাত্র গ্রহণ করে অতীতের গোষ্ঠী জীবন, নারী নিয়ে তাদের বিরোধ অন্য গোষ্ঠীর নারী হরণ করবার সময় যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জয় লাভ করে আকাঙ্ক্ষিত নারীটিকে সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে উজ্জ্বল চিত্রে উপস্থাপিত করেছেন। ‘রুমা’ চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি; রুমা পুরুষচিত্তে কামনা উদ্বেক করা এক নারী মাত্র, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ধর্মে সে আক্রমণকারী পর পুরুষের হাত থেকে রক্ষা পেতে তার মাথায় আঘাত করেছে। আবার পরাক্রান্ত পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে তাকেই স্বীকার করে নিয়েছে। পূর্ব গোষ্ঠীর কথা মনে আনেনি। রুমার মতো অন্য নারীরাও গাঙ্কার গোষ্ঠীর পুরুষদের সঙ্গিনী হয়ে থেকেছে। নারীহরণই গল্পের মূলকথা। গোষ্ঠীগুলির আদিম জীবন ধর্ম প্রকাশে তা মূল্যবান। এদিক থেকে যেকোন নারীহরণই এই আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে বলেই লেখক গল্পটির নামকরণ করেছিলেন ‘রুমাহরণ’।

গল্পটি আত্ম-কথন রীতিতে লেখা। কথক ‘আমি’ সর্বনাম পদের আশ্রয়ে গল্পের আখ্যান-বস্তুর পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের চরিত্রগুলির মুখের ভাষায় মূলত তিনি একই সঙ্গে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর রচনার ভাষা হয়ে উঠেছে তীব্র মোহময় আকর্ষণকারী ও গতিশীল। তিনি ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ভাষা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হ’ল — “ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতন — বেতো ঘোড়ার মতন নয়। শুধু গতিবেগ নয় — ছোট্টার মধ্যেও সৌন্দর্য যেন ছুটে বেরায় — মন যেন ভরে যায়।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই বসু, পৃ. ৭৭) বাস্তবিকই তাই-ই ঘটেছে আলোচ্য গল্পটির ভাবের বাহন ভাষা-সংস্থানের মধ্যে দিয়ে। ভাষার প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে সর্বদাই এই গল্পটিতে। গানে ব্যবহৃত ভাষার ব্যবহারও সাঙ্গীতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত। চরিত্র গুলির রূপবর্ণনার ভাষাও অত্যন্ত গতিশীল বলে মনে হয় — “তিত্তির রূপ দেখিবার মতো বস্তু ছিল। উজ্জ্বল নব-পল্লবের

মতো বর্ণ, কালো হরিণের মতো চোখ, কঠিন নিটোল যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ — ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! তাহার প্রকৃতিও অতিশয় চপল। সে নির্জন পাহাড়ের মধ্যে গিয়া তরু বেষ্টিত কুঞ্জের মাঝখানে আপন মনে নৃত্য করিত। নৃত্য করিতে করিতে তাহার অঙ্গিন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না।” এই নৃত্যচপল চরিত্রটির মতোই গল্পটির ভাষা-রীতিও অতিশয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ভাষা থেমে থাকে না — চলে, চলে বলেই এর গতি সর্বত্র।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রকরণ-কৌশল, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সর্বোপরি বলিষ্ঠ সতেজ প্রবহমান ভাষার প্রয়োগ গল্পটিকে বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠগল্পের সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়েছে। শরদিন্দুর ভাষা-প্রয়োগরীতি সম্পর্কে সুসাহিত্যিক রাজশেখর বসুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

—“আজকাল শুদ্ধ বাংলা দুর্লভ হয়েছে, খ্যাত লেখকেরাও বিস্তর ভুল করেন। যে অল্প ক’জন শুদ্ধি বজায় রেখেছেন তাঁদের পুরোভাগে আপনার স্থান। সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই — আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধ হয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণ।”^৪

শরদিন্দুবাবুর গল্প বলবার ভঙ্গিটিই আপামর পাঠককে আকর্ষণ করে। একবার গল্প পাঠ শুরু করে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠক গল্পপাঠে বিরতি দেন না — যত বড়ই গল্প হোক না কেন — তার কারণ বোধ হয় তাঁর সুললিত রসসিক্ত ভাব ও ভাষা। ‘রুমাহরণ’ গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পটি মূলত আর্যদের ভারতভূমিতে পদার্পণকালের পটভূমিকায় রচিত। ভারতে আর্যদের প্রভাববিস্তার দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ক্ষমতা দখল, নারীহরণ, আর্য-অনার্য সংঘাত ও সমন্বয় প্রভৃতি আর্য-অনার্য সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পটি পাঠে। দুই আর্যযোদ্ধা সৈন্য সামন্ত নিয়ে নিজের ক্ষমতা বলে কৃষ্ণকায়-দস্যু-তক্ষরদের পরাজিত করে স্বরাজ্য স্থাপন করে। তাদের নাম — প্রদ্যুম্ন ও মঘবা। লেখকের ভাষায় — “উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব।” কিন্তু রাজ্য স্থাপনের পর এই বন্ধুযুগল বড়ই সমস্যায় পড়ে, কে রাজা হবে? এই সমস্যার আশু সমাধান সূত্র আবিষ্কার করল বন্ধু প্রদ্যুম্ন। ‘চন্দ্রগ্রহণ’! চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়মে আসে যায়। এই চন্দ্রগ্রহণের সময়কালের ওপর নির্ভর করে তারা তাদের সমস্যার সমাধান করে। প্রথম চন্দ্রগ্রহণের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ পর্যন্ত এক এক করে তারা দুই বন্ধু রাজাসনে বসবে। ঠিক সেই নিয়মেই মঘবা প্রথমে রাজা হয় আর প্রদ্যুম্ন সেনাপতি। চন্দ্রগ্রহণ ব্যাপারটিকে গল্পের মূল কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে এসে লেখক সময় গণনার নূতন একক রচনা করেছেন। যখন সময় সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয়নি, তখন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মানুষ সময় বুঝতে শুরু করে।

মঘবা রাজা হবার পরই যুদ্ধ যাত্রায় বের হয় এবং যুদ্ধ শেষে কোদণ্ড নামক রাজ্যের অনার্য জাতির রাজ কন্যা এলাকে হরণ করে নিয়ে আসে। মঘবা তাকে বিশেষ দিনে বিবাহ করবে তা স্থির হয়। সেনাপতি প্রদ্যুম্ন এলাকে যথারীতি চোখে চোখে রাখে। সমস্যা আরও গভীর আকার ধারণ করে। মঘবা যেদিন এলাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করে সেইদিনই প্রদ্যুম্ন বলে ওঠে — “সেনাপতি মঘবা! মঘবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন। রাজা হওয়ার অভ্যাস তাঁর প্রাণে এমনই বসিয়া গিয়াছিল যে প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। তারপর প্রদ্যুম্নের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই তাঁদের প্রতি চক্ষু পড়িল।

আকাশ নির্মেঘ কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধুম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।” — এখানেই গল্পটির ‘মহামূর্ত্ত’ ধরা পড়েছে। এতদিনের মনের অভিলাষ এক মুহূর্ত্তেই ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে যায় তার জীবনে। নির্মম নিয়তি যেন মঘবার জীবনের সমস্ত আশাকে ক্ষণিকের চন্দ্রগ্রহণের কালো করালছায়া গ্রাস করে নিয়েছে। মঘবা নিরুপায়। কথা তাকে রাখতেই হবে। রাজা হওয়ার শর্ত রাখতে গিয়ে মঘবাকে সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে — এটাই মঘবার জীবনে নিয়তি।

অন্যদিকে এলা মঘবাকে কোনো দিনই ভালোবাসে নি; উপরন্তু মঘবাকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করে। এলার জীবনে প্রেম এসেছিল প্রদ্যুম্নের জন্যে, কিন্তু মঘবার জন্যে নয়। প্রেমিকা এলা চরিত্রের স্বরূপও উদঘাটিত হয়েছে এখানে। তিনজন নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা ও অসহায়তার চিত্র লেখক সরস কৌতুক ও প্রাজ্ঞল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ নাটকের একটি সংলাপ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে—“সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব চিনিয়ে নিয়ে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়।”

প্রাগ্-জ্যোতিষ কথাটি এখানে সময় গণনার পূর্বকালের কথা বলতে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্যদের ভারত আগমনের আগে এদেশে কিংবা আর্যদের মধ্যে সময় গণনার কী রীতি ছিল তা বলা যায় না। তবে ঋগ্বেদে মাস ঋতু বর্ষ ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। লেখক এ গল্পে আর্যদের সেই প্রাকজ্যোতিষ পর্বের কাহিনি বেশ সরসভাবে উপস্থিত করেছেন। ‘মৃৎপ্রদীপ’ ও ‘বিষকন্যা’র কথাবস্ততে যেমন জটিলতার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’ গল্পে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং বেশ একটি লঘু ও সরস কথাভঙ্গী এখানে প্রথম থেকেই বর্তমান। শরদিন্দুর অতীত চারণার মধ্যে ‘সম্ভাব্য’ বাস্তবতার একটি মায়াজাল সৃজন লক্ষ করা যায়। এখানেও তা আছে রাজার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হবে—এই হল সাধারণ রীতি। অথচ প্রদ্যুম্ন এলার প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হয়। এলাও প্রদ্যুম্নের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। অথচ প্রদ্যুম্ন এলাকে পাবার কোনো উপায় খুঁজে পায়

না। এই সমস্যার সমাধান হয় সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে, নিতান্ত প্রাকৃতিক উপায়ে। এক চন্দ্রগ্রহণ থেকে আরেক চন্দ্রগ্রহণ পর্যন্ত এক জনের রাজত্ব কাল। মঘবার সঙ্গে বিবাহের আগেই আকাশে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়। যথারীতি পূর্ব শর্ত অনুসারে প্রদ্যুম্ন এবার রাজা হয় আর মঘবাকে সেনাপতি হতে হয়। প্রদ্যুম্ন রাজা হয়ে মঘবাকে আদেশ দেয় যে, এলাকে নিয়ে আসতে। আলোচ্য প্রাগ্জ্যোতিষ গল্পটিতেও মঘবার জীবনে চন্দ্রগ্রহণ আশা ভঙ্গের প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এলা নামক যুবতী মঘবার হাত থেকে প্রদ্যুম্নের অধিকারে চলে গেছে। চন্দ্রগ্রহণ যেন মঘবার সকল আশায় ছায়ার প্রলেপ ফেলে দিয়েছে। জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে মঘবার।

গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — ‘আদিম’ গল্পটির পটভূমি নির্মাণ করেছেন সুদূর প্রাচীন মিশরের সামাজিক সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে। পটভূমি ও বিষয়-বস্তুর দিক থেকে গল্প নোতুনত্বের পরিচয় মেলে।

প্রাগ্জ্যোতিষ গল্পের উপসংহার বেশ আকস্মিক এবং কৌতুকজনক। গল্প বলা এবং গল্পের ভিতরে অতীতের বিশেষ পর্বের (সম্ভাব্য) জীবনকথা ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্য। এর ঘটনাই মুখ্য। চরিত্র ঘটনা বর্ণনার উপাদান মাত্র। যে অর্থে চরিত্র কেন্দ্রিক গল্প রচনা হয় বা চরিত্রের অন্তর্লোকের উদ্ঘাটন হয় তার স্থান এখানে নেই। কাহিনির উপসংহার ও ঘটনা পরম্পরায় স্বাভাবিক পরিণতি পায়নি।

আদিম (১৩৬৮) গল্পে প্রাচীন মিশরের একটি সামাজিক প্রথাকে কেন্দ্র করে ঘটনা বিন্যাস করা হয়েছে। গল্পটিতে প্রাচীন ইতিহাস অপেক্ষা সমাজ ইতিহাসের একটি প্রাচীন রূপ দেখানো হয়েছে। সে রূপ বিবাহ ব্যবস্থা নিয়ে। প্রাচীন মিশরে ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হত। শুধু মিশরে নয়, রোমে, দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকাদের মধ্যে এবং আরো অনেক জায়গায় এরকম প্রথা ছিল। রক্ত সম্পর্কে নিকট জনের মধ্যে বিবাহ ও যৌন সম্পর্ক অনেক জাতির মধ্যে ছিল। গ্রেকো রোমান রাজত্বের পর্বেও মিশরে এরকম প্রথা দেখা যায়। রোমানদের মধ্যে এরকম সম্পর্ক সাধারণের জন্যে নিন্দনীয় হলেও রাজাদের মধ্যে তা একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

শরদিন্দু গল্পটির নাম দিয়েছেন ‘আদিম’। আদিম মানুষের মধ্যে নিকট সম্পর্কের যৌনতা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রোমান সভ্যতার কালে কিংবা মিশরে রাজ পরিবারে এবং সাধারণের মধ্যে নিকট সম্পর্কের যৌনতা, ভাইবোন বিবাহ—একে ঠিক আদিম বলা যায় কিনা সন্দেহ। Numerous papyri and Roman census declaration to many husbands and wives being brother and sister of the same father and mother. উদাহরণ হিসেবে একথাও বলা যায় টলেমি রাজ পরিবারে ক্লিয়োপেট্রা (সপ্তম) তার ছোট ভাই ত্রয়োদশ টলেমিকে বিয়ে

করেছিলেন এবং তাদের মা বাবাও ছিলেন ভাই বোন। কাজেই একথা বলা যাবে না যে কেবল আদিম মানবের মধ্যেই এরকম সম্পর্ক ছিল। এরকম সম্পর্ক পরবর্তীকালে সমাজে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে তা বলা যায় না।

আমি গল্পের কাহিনি সামান্য। আর বিশেষত্ব কিছু চোখে পড়ে না। শরদ্দিন্দুর অন্যান্য গল্পে Plot গঠনের যে কৌশল দেখা যায় তা এখানে নেই। Plot এর চমৎকারিত্ব অসম্ভব ও অভাবনীয়ের সম্ভাব্য উপস্থাপনা এসব এখানে নেই। কাহিনিতে দেখা যায় মিশর রাজ কোনো দেশ (সম্ভবত জার্মানী রোম বা গ্রীস) জয় করে বহু বন্দী নিয়ে দেশে ফিরলেন। রাজার এক ক্ষুদ্র সেনানী সোমভদ্র বন্দি এক নারী মেরুকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দেয়। মেরুকা হাতে স্বর্গ পায়। কিন্তু তাদের সমাজে ভাইবোনের বিয়ে সাধারণ রীতি। সোমভদ্রের বোন শফরী তারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। সোমভদ্রের বোন শফরী তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ভালোবাসা পায় না। সোমভদ্র তাকে সব খুলে বলে। প্রতিহিংসা পরায়ণ শফরী ডাকিনী বিদ্যার আশ্রয় নিয়ে সোমভদ্রের সঙ্গে মেরুকার বিয়ে বন্ধ করে। যথারীতি এর কিছুদিন পরে তাদের বিয়ে হয়। শরদ্দিন্দু এখানে কাহিনি রচনার মুন্সিয়ানা অপেক্ষা বিবাহ প্রথার দিকটাই দেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন। সুকুমার সেন ঠিকই বলেছেন—“ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে আদিম একটু দুর্বল।” কারণ ইতিহাসের ঘটনা এ গল্পে জমাট বাঁধে নি। “আমাদের কাছে এ ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণ্য ঠেকে”— একথা বলার অর্থ বোধহয় আমরা একে মনে প্রাণে মানতে পারি না বলে আমাদের রস সংস্কারে আঘাত লাগে। তবে এ কাহিনি বহু প্রাচীন মিশরের পটভূমিতে স্থাপিত। দ্বিতীয়ত, তার ঐতিহাসিক সমর্থন যে আছে সুকুমার সেনও তা স্বীকার করেন। দশরথ জাতকের কাহিনিতে পাই রাম ও সীতা ভাইবোন। আমাদের সংস্কৃতিতেও তো এরকম ঘটনার কথা পাওয়া যায় তাহলে। আসলে বিবাহ পদ্ধতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আদিম নরনারীর যৌন সংস্কারের সঙ্গে একালের পদ্ধতির মিল হবে না। লেখকের কথায় আমাদের মনে হয়, আদিমতা মানুষের রক্তে মিশে রয়েছে। তাই আদিম ক্রিয়া কলাপ মানুষের পিছু ছাড়তে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আপন সাধনায় তা সুচিন্তিত করে তুলেছে।

কিন্তু গল্প জমাট না বাঁধার কারণ গল্পের মধ্যে সম্ভাব্যতা এবং আকস্মিকতার সমাবেশ হয়নি। অন্যদিকে প্রাচীন মিশরের বিবাহ রীতির কথা বলাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। এজন্য মেরুকাকে পছন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত শফরীকেই সোমভদ্র বিয়ে করেছে। গল্পটিতে ভাই-বোনের বৈবাহিক সম্পর্ককে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে শফরীর প্রেমার্তি। অন্যপক্ষে শফরীর প্রণয় প্রার্থী সহোদর সোমভদ্র লুপ্তিতা নারী মেরুকার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করায় শফরীর হৃদয়

যন্ত্রণা আরও বেড়ে উঠেছে। শফরী — সোমভদ্রকে লাভ করবার জন্য বিভিন্ন সংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই গল্পে স্থান পেয়েছে আদিম সংস্কার, মন্ত্রগুপ্তি, বশীকরণ মন্ত্র ও অযথা রক্তপাত প্রভৃতি লৌকিক সংস্কার। বহুদূর কালের সমাজ ও সভ্যতায় এই লোকজ উপাদান বা সংস্কারগুলি যে দৃঢ়মূল ছিল তাও আঁচ করে নেওয়া যায়। ডাকিনীর সঙ্গে শফরীর কথোপকথনে বেশ নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছে — যা চমকপ্রদ বটে। ‘আদিম’ গল্পটিতে একমাত্র নায়িকা চরিত্র শফরী অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে। দ্বন্দ্বমথিত প্রেম, হতাশা, হারানোর যন্ত্রণা, পুনর্বীর প্রাপ্তি — অনেকটাই তাকে পরিণত করে তুলেছে। সোমভদ্রের যন্ত্রণাও কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বর্ণনা করেছেন — “তাহার নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে যে অপরিসীম হতাশা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সোমভদ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল; সে মেরুকার পানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আবেগ-স্থূলিত স্বরে বলিল — ‘মেরুকা, তুমি আমার ভগিনী! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।’” সোমভদ্রের এই কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে মেরুকা বলেছে, “তোমাদের দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ হয়! আমাদের দেশে হয় না।” স্পষ্টতই দু’টি বিপরীত মুখী সমাজের সংস্কার ও রীতি-নীতির পরিচয় পাই এই গল্পটি পাঠে। এখানেই গল্পটির নতুনত্ব। মেরুকার রূপ সোমভদ্রকে ক্ষণিক আকর্ষণ করলেও শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে। কারণ মেরুকার প্রতি সোমভদ্রের তীব্র আসক্তি যদি থাকতো তাহলে হয়তো সেনাপতি অমোঘভল্লের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেনানী সোমভদ্র মেরুকাকে নিজের করে নিতে তার মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় সোমভদ্রের পিছুটানের মধ্যে দিয়ে। আসলে গল্পকারের ইচ্ছায়ই যেন প্রকটিত হয়েছে এই চরিত্রটিকে অবলম্বন করে।

‘আদিম’ গল্পটির কাহিনীতে গল্পকার অতীতকালের যুগযন্ত্রণা, অস্থিরতা, ক্রীতদাসী প্রথা, নারীদের হরণ, নারীদের ইচ্ছে মতো ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা, বহুভোগ্যা নারীর ভাগ্য বিপর্যয়, রাজান্তঃপুরের অনির্বচনীয় অভব্যতা, অসংযমী পুরুষের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বিষয় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির ‘আদিম’ নামকরণের মধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজ্ঞাত সত্য ও সামাজিক তথ্যের প্রতি। ‘আদিম’ নামকরণ হলেও চরিত্রগুলির মধ্যে আদিমতা, আবিলতা, কামনার তীব্রতা পরিলক্ষিত হয় না বরং প্রকৃত পবিত্র প্রেম-সম্পর্ক ও হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তিই বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। এদিক থেকে ‘আদিম’ শব্দটিকে লেখক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং শব্দটিও তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে।

শরদিন্দুর দুর্বলতা দেখা যায় প্রধানত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি। স্বাভাবিকভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক উপাদানের প্রতিও তাঁর

প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাই। সহজাত সাহিত্য প্রতিভা এবং ইতিহাসের প্রতি আগ্রহে তাঁর অতীতশ্রী বা ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের কাহিনীতে সেসব বিষয় আশয়ের কথা পাই। উপন্যাসে ইতিহাসের অতীতকে উপস্থিত করা যায় কীভাবে? কীভাবে তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়? সে ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা জানা যায়। উপন্যাসিকেরা এজন্য কখনো অতীতকে নিকট এনে বর্ণনা করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলি তার প্রমাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের মাধ্যমে বর্তমান থেকে অতীতে গেছেন। শরদিন্দু এই কৌশলের পাশাপাশি জাতিস্মরতাকে যোগ করলেন। জাতিস্মরতার সুকৌশলী ব্যবহারে অতীতকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তিনি সবচেয়ে সফল। শরদিন্দু ব্যক্তিগত জীবনে জন্মান্তরবাদ, জ্যোতিষচর্চা প্রভৃতি ব্যাপারে আগ্রহ ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর রচিত গল্প ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘রুম্মাহরণ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘মরু ও সঙঘ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’ প্রভৃতিতে পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা রূপ পেয়েছে। প্রাচীনকালের ধূসর ইতিহাসকে আলোকময় করে তুলেছেন এই প্রকরণ কৌশলের সাহায্যে। এই ধরণের লেখাগুলিতে বর্ণক বা কথক অতীতের কথা স্মরণ করতে পেরেছেন কোন আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে। এটা গল্পে বেশ চমক সৃষ্টি করে। শরদিন্দু তাঁর অনেক গল্পে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ড. নিতাই বসু তাঁর ‘সত্যাক্ষেপী শরদিন্দু’ গ্রন্থে বলেছেন — “সর্বাধিক সফল শরদিন্দুর জাতিস্মর-ধারার গল্পগুলো। প্যাশন এখানে প্রেমের ওপর স্পর্ধিত ভঙ্গিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু তা নিছক যৌন আবেগ নয়, ফ্রেয়েডীয় মনোবিকলন নয়, বাসনার বক্ষোমাঝে চিরবিচিত্র হাহাকার। জন্মান্তরের স্মৃতি, জাতিস্মরের কল্পনা যেন ফ্রেম, যার মধ্যে ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবি বসানো হয়েছে।”

জাতিস্মর-মূলক গল্পে শরদিন্দু মূলত স্বপ্ন, জন্মান্তরবাদ, কোনো সদৃশ বস্তু, কোনো সদৃশ ঘটনা, ছায়াভাস, অবচেতন অনুভূতি, গন্ধ, (গন্ধের মধ্যে দিয়ে যেমন - ‘প্রত্নকেতকী’তে কেতকী ফুলের সুবাসে জাতিস্মরতায় প্রবেশ) ইত্যাদির মাধ্যমে সুদূর ধূসর অতীত জীবনে প্রবেশ করেছেন। জাতিস্মর সম্পর্কে তাঁর ‘অমিতাভ’ গল্পের নায়ক বলেছে— “আমি জাতিস্মর! ছিয়ান্তর টাকার মাহিনার রেলের কেরানী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শতমহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।” জাতিস্মরতা সম্বন্ধে মানুষের মনে বিশ্বাসবোধের অভাব থাকে আবার বিশ্বাসবোধও থাকে। এরকম অনেক কাহিনীর কথা আমরা শুনি। তাই লেখক প্রথমেই এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের কথা উত্থাপন করে গল্প শুরু করেছেন। তিনি ‘অমিতাভ’ গল্পে আটপৌরে, অল্প শিক্ষিত রেলের কেরানী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। একজন অল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মনে সংস্কারের

প্রতি বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। রেলের কেরানীর পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণের মধ্যে দিয়ে ‘অমিতাভ’ গল্পটির সূত্রপাত। বাংলা গল্প উপন্যাসের বিষয় হিসেবে ইতিহাসের অনুসঙ্গ ব্যবহার উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হয়েছে। ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কথা যদি না-ও ধরি, তাহলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসে’র কথা অবশ্যই ধরতে হবে ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসে’র দুটি পর্ব। উক্ত গল্পগুলিতে জন্মান্তর বোধকে আশ্রয় করে তিনি প্রাচীন ভারতের শ্রী ও সভ্যতার একটি রূপ গড়তে চাইলেন। এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে ‘অমিতাভ’ এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। ‘অমিতাভ’ গল্পটি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জাতিস্মর’-এর (১৩৩৯) অন্তর্ভুক্ত। ‘অমিতাভ’ গল্পটি সম্পর্কে শরদিন্দুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— “অমিতাভ গল্পের মূলে একটুখানি পৌরাণিক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নাই।”

গল্পে শিল্পশ্রীর প্রয়োজনে জন্মান্তর প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু জন্মান্তর তাঁর গল্পের বিষয় নয়। প্রাচীন ভারতের স্বল্পোজ্জ্বল ইতিহাস খণ্ডকে তিনি তাঁর এই গল্পে আলোকিত করে তুলেছেন। গল্পটি মূলত আত্মকথন রীতিতে লেখা। রেলের এক অধস্তন কেরানী গল্পের প্রধান চরিত্র। সে নিজেই কথকের ভূমিকা পালন করেছে। আত্মকথন রীতির আশ্রয়ে গল্পটি আদ্যন্ত পরিবেশিত হয়েছে। রেলের এক কেরানী রেলের পাস পেয়ে রাজগীরে বেড়াতে যায়। রাজগীরের ঘন-জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে কালের যবনিকা সরে গিয়েছিল। কথক অতীত জীবনে প্রবেশ করে যে দৃশ্য দেখেছিল, তা কত বছর আগেকার কথা! দু’হাজার বছর, না তিন হাজার বছর; ঠিক জানে না। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, তখন পৃথিবী আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, ঘাস আরও সবুজ ছিল। কথক তাঁর এই নবজাত দৃষ্টি প্রসঙ্গে নিজেও একটু সন্দেহের ভাব বজায় রেখে গল্প বলতে শুরু করেছে। “আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি।” আবার একই ভাবে লিখেছেন “জাতিস্মর! উপহাসের কথা - অবিশ্বাসের কথা!” এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতার মধ্য দিয়ে কথক এবার তাঁর নিশ্চয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন — “তবু আমি বারবার বোধ হয় বহুশতাব্দ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।” রাজগীরের ধ্বংস-স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর পূর্ব জন্মের স্মৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখেও তাঁর পুরোনো দিনের কথা মনে পড়েছে। ঐ শিলাশিল্পটি তাঁরই রচনা। আসমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট কণিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হয়েছিল তখন বিহারের শ্রী বাড়ানোর জন্য সে এটি তৈরি করেছিল। আর

তখন তার নাম ছিল পুণ্ডরীক, রাজ সভার প্রধান শিল্পী রাজভাস্কর। জন্মান্তরবাদ তৈরি প্রসঙ্গ ব্যবহারে সেকালের এবং একালের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে— “তখন মানুষ খুব বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতিতুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধকরি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রুরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।”— সম্রাট কণিষ্কের নামটুকু ইতিহাস মাত্র, রাজগীর নামক স্থানটিতে ইতিহাসের ছোঁয়াও আছে। কিন্তু লেখক তাঁর কল্পনা শক্তির জোরে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রগাঢ় উপলব্ধি বশত জাতিস্মরতার কৌশলে দ্বিতীয় পর্বের জন্মান্তরবাদের কথা, সেকালের সামাজিক অবস্থার পরিচয় ও প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

জন্মান্তরের তৃতীয় পদ্ধতির আশ্রয়ে ‘অমিতাভ’ গল্পটির মূল অভিপ্রেত বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পকারের ভাষায় — “ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূস্রকুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বছর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি।” দূরাতীতের এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে কথক পূর্বজন্মে দেখেছিল — এ গল্পে তারই স্মৃতিসঞ্চিত হয়েছে। এইভাবে অতীতের কথা বলার বলেই কথক তাঁর বহু পূর্বজীবনের সঞ্চিত স্মৃতির ভিতর থেকে একটি কাহিনি বলতে শুরু করে — এই কাহিনি কথকের কোন এক পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার কথা। সেকথা রাজা অজাতশত্রুর কালের। সে জন্মে কথক শ্রেণিনায়ক ছিল। চারিদিকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য গোপনে একটি দুর্গ নির্মাণ করবার পরিকল্পনা এই কাহিনির পটভূমি। রাজা অজাতশত্রুর কালে রাজকার্য কী গোপনীয়তার আশ্রয়ে করা হত তার কিছু বিস্ময়কর বর্ণনা পাই এখানে। গল্পে শ্রেণিনায়ককে মন্ত্রী দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব পায়। পথে বিভিন্ন ছদ্মবেশে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের গুপ্তচররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাই বৌদ্ধ পাষণ্ডীদের প্রতি মন্ত্রীর অতিশয় বিদ্রোপের কারণ বৌদ্ধরা গুপ্তচর বৃত্তি অবলম্বন করে নানা দেশে ঘুরে খবর সংগ্রহ করে। মন্ত্রী বিশেষ করে পাষণ্ডী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে শ্রেণিনায়ককে সতর্ক থাকতে বলে দিয়েছেন।

দুর্গ নির্মাণ-প্রসঙ্গ গল্পটির অন্যতম বিষয়। তার সঙ্গে পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে রাজকার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কবাহিতা। কিন্তু এগুলির কোনোটিই এই গল্পের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পূর্বজীবনের বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার গল্প বলবার জন্যই এই পটভূমি করে আশ্রয় নিয়েছে কথক। কথা বলেছে। গল্পে আদি অন্তের সামঞ্জস্যের অভাব অন্তত সেকথাই

স্মরণ করায় গল্পে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। কেবলমাত্র কথকের পূর্বজীবনের কথায় গল্পের পরিণতিকে স্বীকার করতে হয়। পাশাপাশি আদি অস্তের মধ্যে সামঞ্জস্যের যোগসূত্রও খুঁজব।

গল্পের পরিণতি প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্কে মন্ত্রির সতর্ক থাকবার কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মন্ত্রির কড়া নির্দেশ বৌদ্ধ পাষণ্ডীদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনে হত্যা করতেও বলেন। এই কথাটুকুই যেন পরিণতির দিকে যাওয়ার প্রথম ভিত্তি। একে বলা যেতে পারে পূর্বানুমান (Foregrounding)। যে বিষয়টি গল্পে পরে কথিত হবে -এ তারই পূর্বসূত্র। এই সূত্রটুকু না থাকলে গল্পের পরিণতি একেবারেই শিকড়হীন হয়ে পড়তো।

দুর্গ নির্মাণ করতে যাওয়ার পথে এক গুপ্তচরের দেখা পাওয়া যায়। তাকে দুর্গের নীচে জীবন্ত পুঁতে দেবার কথা হয়। কিন্তু দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করবার সময় দেখা যায় সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই বলির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেই সূত্রেই শিবিরের প্রহরী গুটিকয়েক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে এনে উপস্থিত করে। অমিতাভ বুদ্ধ তাঁদের মধ্যে একজন। বলি সংগ্রহ হয়েছে জেনে শ্রেণিনায়ক তাদের আনতে বলে। কৌপীন বাস ভিক্ষাপাত্রধারী ভিক্ষুদের মধ্যে অমিতাভ গৌতমের মুখের দিকে তাকিয়ে কথকের অন্তরাত্মা যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো সচকিত হয়ে ওঠে। তাঁর মুখকান্তি কথকের সব সতর্কতা ভুলিয়ে দেয়। দেবতার মুখমণ্ডলে যে জ্যোতির্বলয় দেখা যায় তাই সে এই বৃদ্ধের মুখের চারদিকে দেখতে পায়। বৃদ্ধের মধ্যে থেকে উঠে আসে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস। অমিতাভের পদপ্রান্তে পতিত হয়ে সে প্রার্থনা করে

“অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।”

অমিতাভ তাকে ত্রিশরণ গ্রহণ করে গৃহীর ধর্ম পালন করতে বলেন। কথক এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানায় “কীট ছিলাম এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম” অসুর প্রকৃতি দিগ্‌নাগের হৃদয় বিগলিত ওঠে, চক্ষু অশ্রুসজল হয়। আর পাঠক হিশেবে এই অশ্রুজলের পুলকে আমাদেরও চিত্তাকাশও অপূর্ব আনন্দানুভূতিতে উদ্ভিসিত ওঠে।

আগেই বলেছি যে, ‘অমিতাভ’ গল্পের পরিণতি গল্পের আরম্ভের ঘটনার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু এ এক জাতিস্মরের পূর্বজন্মের কথা — সেই হিশেবে একে গ্রহণ করা যায়। গল্পের একটি বিরোধমূলক বিন্যাস এই পরিণতিকে আরো আনন্দময় করে তোলে। মহামন্ত্রি বর্ষকার বৌদ্ধ পাষণ্ডীদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সন্দেহপ্রবণ শ্রেণি নায়ক চিন্তিত। পথে গুপ্তচর ধরা পড়ায় এই সন্দেহ আরও প্রবল হয়েছিল। আর শেষে এই বৌদ্ধদের সম্বন্ধেই শ্রেণিনায়কের সদর্শক অনুভূতিতে গল্পট হয়ে ওঠে সরস ও মনোরম।

অন্যান্য গল্পের মতো গল্পটির মধ্যে একটি ‘মহামুহূর্ত’ বা ‘চরমতম ক্ষণ’ (climax or

pointing finger) রয়েছে। আলোচ্য ‘অমিতাভ’ গল্পটিতে কাহিনি এবং প্লটের প্রয়োজনে খণ্ড-খণ্ড ভাবের অবতারণা থাকলেও শেষে বিশেষভাব সম্পন্ন হয়ে উঠেছে এতেই গল্পের গল্পত্ব বজায় রয়েছে। গল্পে বর্ণিত মহামুহূর্তটিকে উল্লেখযোগ্য— “এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাঙ্গা যেন তড়িৎ স্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বৃদ্ধের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনো দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থিরসৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতিম্লিষ্ট, অতিশীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত।

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল — “অমিতাভ! অমিতাভ!” গল্পটি পড়ে সমকালীন লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন— “তোমার কাছে অনেক পেয়েছি। তোমার অমিতাভ পড়ে এখনো কাঁদি।”

গল্পটি শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে প্রথম রচনা। এটি ১৯৩০ এ লেখা হয়। এর পরে অন্য গল্পগুলি লেখা হয়েছে। শরদিন্দু অম্নিবাস (আনন্দ) ষষ্ঠ খণ্ডের গল্প পরিচয় অংশে শোভন বসু জানিয়েছেন গল্পগুলি “রচনাকাল অনুসারে সন্নিবিষ্ট।” (পৃ. ৪২৩) এই গল্পটিতে শরদিন্দু প্রথম জাতিস্মরতাকে অবলম্বন করে অতীতের অন্তরে প্রবেশ করবার পথ তৈরি করেছেন। তখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক গল্পগুলি প্রত্যক্ষভাবে সেই কালের পটভূমিতে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’র স্টাইলেই তাদের মূল অবলম্বন। কিন্তু শরদিন্দুর উপন্যাসগুলিতে এই রীতি গৃহীত হলেও গল্পে তিনি ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছেন। ‘অমিতাভ’ গল্পটিতে সেই রীতির সূত্রপাত। এজন্য পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে তাঁকে এই সব কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। গল্পের প্রথমে এই প্রসঙ্গে নায়কের মুখে তিনি বলিয়েছেন “আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব?” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫) নিজেকে নিয়ে কৌতুকও করেছে গল্পের নায়ক। বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম নিয়ে সন্দেহভঞ্জন করবার কথা বলে আমাদের জাতিগত মনোভাবকেও তিনি খোঁটা দিতে ছাড়েননি। সুতরাং গল্পের নায়ক তার স্মরণে আসা পূর্ব পূর্ব জীবনের কথা মনে রেখেই আমাদের গল্প বলতে শুরু করেছেন। ‘অমিতাভ’ এক জীবনের ঘটনা। ‘মুৎপ্রদীপ’ আর একজীবনের কাহিনি। কাজেই ‘অমিতাভ’ গল্পে কথক যে একাধিক পূর্ব জন্মের কথা বলেছে তাতে সে বোঝাচ্ছে যে জাতিস্মর এবং তার পূর্ব পূর্ব জীবনের কথা সে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের

জন্যে বলেছে। গল্পকারের অভিপ্রায় জাতিস্মরতার মাধ্যমে না জানা অতীতের মধ্যে প্রবেশ করে সে কালের মানুষের জীবন রহস্য উদ্ঘাটন করা। যে ইতিহাস সর্বজনীন তা লেখকের গল্পের ফ্রেম বা পট, আর যে কাহিনি মানুষের গৃঢ় গহণ জীবন রহস্যের—সেই কাহিনি রচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য। ইতিহাস এখানে পট মাত্র—জীবন কাহিনি লেখকের রচনা, কিন্তু সে জীবনকথা অতীতের মানুষের জীবনকথা।

‘অমিতাভ’ গল্পের কথকের জাতিস্মরতার প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করবার পর লেখক তার এক পূর্ব জন্মের তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং গভীর উপলব্ধির কথা বলতে শুরু করেছেন। গল্পে তো মানুষের কোনো অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি, জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা বা বোধের কথা বলা হয়ে থাকে। ‘অমিতাভ’ গল্পের কথক তার জীবনের একটি অতিশয় গভীর অভিজ্ঞতা ও অপ্রমেয় উপলব্ধির কথা বলতে এসেছে। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যা তার জীবনের মর্মমূলকে পর্যন্ত নাড়িয়ে গেছে—তার জীবনের লক্ষ্য এবং বেঁচে থাকবার অর্থকে পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। সে এই নবজীবন চেতনা বোঝাতে বলেছে “কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮) এই অভিজ্ঞতার শরিক পাঠকও হয়ে পড়ে। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক শরদিন্দুকে লিখেছেন “তোমার কাছে অনেক পেয়েছি। হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি। তোমার অমিতাভ পড়ে কেঁদেছি। এখনও কাঁদি। তোমার দিওনাগের মত কেঁদে গলে যেতে চাই পারি না।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, চিঠিপত্র, পৃ. ৪৪৯) অর্থাৎ গল্পের শেষের যে উপলব্ধি তা সচেতন বুদ্ধিমান পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়ে গভীর রেখাপাত করেছে—এ তারই প্রমাণ। এরকম একটি অতিশয় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ‘অমিতাভ’ গল্পের বিষয়। কিন্তু লেখক সুকৌশলী এবং গল্পের গঠনভঙ্গী সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন। তিনি গল্পের প্রথমেই সেকালের গুপ্তচর বহুল রাজধানীতে কীরকম গুপ্ত উপায়ে কার্যোদ্ধার করতে হত তার একটি সুন্দর কৌতূহলোদ্দীপক এবং নাটকীয় পরিচয় দিয়েছেন। আবার রাতে বিশ্রামের সময় কীভাবে গুপ্তচর জলে বিষ দিয়ে সবাইকে মারতে চেয়েছে কীভাবে চাটুবাদের দ্বারা ভণ্ড জ্যোতিষী সেজে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছে তারও সুন্দর বর্ণনা এখানে পাই।

গল্পটিতে প্রথম থেকেই কৌতূহল বজায় রাখা হয়েছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী গল্পটির ভাষা যথাযথ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন তথা ধ্রুপদী যুগের বর্ণনায় লেখক তৎসম শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সমাসবন্ধপদের প্রয়োগে ভাষার বাধুনি এবং গাভীর্য রক্ষা করেছেন। তাঁর সংস্কৃতানুসারী কাব্যধর্মী ভাষা, প্লটের কারুকলা, ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক উপস্থাপনাও নাটকীয় পরিবেশ রচনা গল্পটিকে এতটাই মনোগ্রাহী করেছে যে এর কোনো দুর্বলতা প্রথমে পাঠকের চোখে পড়ে না। ড. নিতাই

বসুর ‘সত্যশ্বেষী শরদিন্দু’ মন্তব্য প্রণিবানযোগ্য— “শরদিন্দুর কাহিনী স্রোতের গতি ও তীব্রতা, চরিত্র প্রতিষ্ঠা, গল্পের নাটকীয়তা, এমনকি বর্ণনার ছটা ও ঘটনার ঘনঘটা তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে দেয়।”^৬

‘অমিতাভ’ গল্পটি সম্পর্কে নিতাইবাবুর এই মন্তব্যটি সমর্থনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের ইঙ্গিতপূর্ণ গীতি কবিতার ভাষার সঙ্গে শরদিন্দুর ছোটগল্পের ব্যবহৃত ওজস্বী ও গতিময় ভাষার কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা ছোটগল্পে লেখকেরা মানবজীবনের যে সব জটিল সমস্যার রূপায়ণ করতে চান যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সেখান থেকে অনেকটাই সরে গল্প বলা ও গল্পরস সৃষ্টি করার কাজই তিনি করে গেছেন। তার অর্থ এই নয় যে মানবজীবনের কোনো সমস্যার রূপায়ণ তার গল্পে নেই। তিনি সাধারণ রোমান্সরসের স্রষ্টা। অতীতের ইতিহাস তাঁর এই রোমান্সের জগৎ রচনায় পটভূমি। মানব মানবীর প্রেম, প্রতিহিংসা, শৌর্য ব্যর্থতা বিষাদ—এ সবই তাঁর প্রধান উপকরণ। এর বাইরে তিনি পা বাড়াননি। প্রাচীন ভারতের যে পটভূমিতে তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীদের উপস্থাপনা হয়েছে সেখানে মানুষের আধুনিক জীবন সমস্যার ছায়াপাত হওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মত হ’ল — “রস সৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮) প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ণতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সমস্যা সংকুল মানব জীবনের রূপায়ণ যে আধুনিক সমাজের পটভূমিতে হচ্ছে তা নিয়ে শরদিন্দুর বিচার হবে না। স্বভাবতই তিনি তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।

যে কালের মানুষ সহজ জীবনবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, প্রেম, প্রতিহিংসা, সরলতা, নিষ্ঠুরতা বা ঈর্ষার দ্বারা পরিচালিত হত সেসকল মানুষকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অমিতাভ’ গল্পটিতে দেখিয়েছেন। এই গল্পের কথক বলেছে তখন মানুষের মধ্যে ত্রুরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। আমাদের এই গল্পের কথক শ্রেণিনায়ক কুমার দত্ত কিংবা দিগ্‌নাগ, গুপ্তচর ক্ষপণক এই শ্রেণির মানুষ। দিগ্‌নাগকে কঠোর চরিত্রের মানুষ হিসেবে লেখক চিহ্নিত করেছেন। সে জ্যাস্ত মানুষকে মাটিতে পুঁতে দিতে পারে। তাতে তাঁর স্নায়ুবিকার হয় না।

গল্পের নাম ‘অমিতাভ’। কথক তার এক পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য এ কাহিনি বলতে এসেছেন। অমিতাভকে সে একজন্মে দেখেছিল। এ গল্পে সেই জীবনের কথাই বলা হয়েছে। ‘অমিতাভ’কে নিয়ে সমস্ত গল্পে প্রায় কোনো কথা নেই। শ্রেণিনায়ক কুমার দত্ত কোন পরিস্থিতিতে ক্ষণকালের জন্য অমিতাভকে দেখেছিল, কীভাবে তার জীবন সেই পুণ্য দর্শনে আমূল বদলে

গিয়েছিল দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, নিষ্করণ অসুর প্রকৃতি দিগ্‌নাগও কীরকম গলদশ্ৰু বিকৃত কণ্ঠ হয়ে অমিতাভের শরণ নিয়েছিল—গল্পের শেষে সেই কথা বলা হয়েছে। সমস্ত ঘটনাবলী, এই অমিতাভকে দেখতে পাওয়ার মুহূর্তটির জন্য সাজানো। এমন কি গল্পের প্রথমে মহামন্ত্রি বর্ষকারের উপদেশ (গৌতম পরাবলুক, ধৃত, কপটী) বৌদ্ধদের নির্দয়ভাবে হত্যা করার প্রসঙ্গও অত্যন্ত সচেতনভাবে এসেছে। মাঝের ঘটনাগুলি এই পরিণতির দিকে চলেছে। পথে ভণ্ড জ্যোতিষী-গুপ্তচরের কাহিনিটিও মনোরঞ্জক, উদ্ভেজনা সৃষ্টিকারী এবং প্রয়োজনীয়। সে আত্মহত্যা করার জন্যই নূতন ‘বলি’র প্রয়োজন হয়েছে। বুদ্ধ সহ তাঁর শিষ্যেরা এই অবকাশেই কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। কাজেই গোটা কাহিনির সজ্জাই এই পরিণতির জন্য নিরূপিত। সেদিক থেকে ‘অমিতাভ’ নাম যথার্থ হয়েছে। ‘অমিতাভ’ শব্দের অর্থ ‘যাঁর আভা বা জ্যোতি অমিত’। গল্পের মধ্যে এই আভার উল্লেখ আছে। “এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল।... দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছিল, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮) কথক নিজেই এঁকে দেখে বুঝতে পেরেছেন, তার মুখ দিয়ে একটিই শব্দ উচ্চারিত হয়েছে “অমিতাভ। অমিতাভ।” আবার গল্পের শেষে দেখি কথক এর শরণ নিয়েছেন এবং ত্রিশরণ গ্রহণ করেছেন। একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কথক বলেছে—“কীট ছিলাম এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮) সেদিক থেকে গল্পে কোনো আদি অন্ত্যের সামঞ্জস্যহীনতা নেই। গল্পের নাম অমিতাভও যথার্থ।

জাতিস্মর-ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হ’ল ‘বিষকন্যা’। গল্পটি তাঁর বিষকন্যা গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ‘অমিতাভ’ গল্পে লেখক যেভাবে জন্মান্তরের কথা বর্ণনা করেছেন সেভাবে কিন্তু ‘বিষকন্যা’ গল্পে সেই প্রকরণ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। অন্যান্য গল্পে যেমন অতীত চারণার জন্য তিনি কোনো একটা উপাদান ব্যবহার করে পূর্ব স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছেন কিন্তু এখানে তেমন করেন নি। গল্পের শেষে তিনি পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—“বহুদূর অতীতের এই বিয়োগান্ত নাটিকায় আমি — এই জাতিস্মর —কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করি নাই; করিবার প্রয়োজনও নাই। হয়তো বিদূষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, হয়তো রাজটীকা ললাটে ধারণ করিয়াছিলাম, কিংবা হয়তো শৃগালের দংষ্ট্রাক্ষত গণ্ডে বহন করিয়াছিলাম।”

গল্পটি কথকের কোনো পূর্বজন্মের ঘটনা হলেও কাহিনিটি ইতিহাসের পটে স্থাপিত হয়েছে।

শরদিন্দুবাবু জন্মান্তর প্রসঙ্গ ব্যবহার করে অতীত ইতিহাসের সুপ্ত জীবনের উপর ক্ষণিকের আলোক সম্পাত করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সেকালের মানুষের জীবন কথার উপস্থাপনা। তাঁর পদ্ধতি পূর্বজন্মের স্মৃতি কণ্ঠয়ণ; আর যে ইতিহাসের উপর কালের যবণিকা পড়ে গেছে তাকে রোমান্সের রঙে রাঙিয়ে তোলা। বহু শতাব্দী পূর্বেকার যে সমস্ত মানুষের জীবন-সূত্র গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে জটিলতা তৈরি করেছিল — ইতিহাস যার কথা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল সেই জীবনের কথা ফিরিয়ে আনা। লেখক যদিও রোমান্স নির্ভর তবু অতীতের জীবন কীরকম ছিল তার সম্ভাব্য বিবরণ তিনি ইতিহাসের অনুসরণ করেই দিতে পেরেছেন।

‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘বিষকন্যা’ গল্পে তিনি অতীত ইতিহাসের রূপ উদ্ঘাটন করেন নি, বরং সেই ইতিহাসের ভিতরে যে মানুষগুলি একদিন জীবন্ত ছিল, যাদের জীবনে সুখ-দুঃখ-প্রেম-বিরহ, হিংসা প্রতিহিংসা প্রবল ছিল, সেই মানুষগুলিকে প্রাণ দান করেছেন। সেই কাল আজ দূরাতীত, মানুষগুলির সেই রূপও মায়াময় কিন্তু কবির কল্পনায় তারা বেঁচে আছে, তারা জীবন্ত তত্ত্বগত দিক থেকে যাকে বলা হয় ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ শরদিন্দুর কবি মন। অতীত চিরকালই মানুষের কাছে অস্পষ্ট, রহস্যপূর্ণ — তা যদি আবার ইতিহাসের কালো জ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে তাহলে তার রহস্য আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। রোমান্টিক মন এই অতীতের রোমান্স রসে ডুব দিতে চায়। কিন্তু সেই অতীতের মধ্যে প্রবেশ করবার উপায় কী? যে অতীত-দূর, অনিশ্চিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন; ইতিহাস যে জীবনের রাজবৃত্তের কাহিনিটুকুর সম্মানে ক্লাস্ত সেখানে কবির কল্পনাকে প্রেরণ করা ছাড়া আর রক্তমাংসের জীবন নির্মাণ করবার কোনো উপায় নেই। শরদিন্দু ইতিহাসের পটভূমিতে সেই কল্পনার মায়ালোক সৃষ্টি করে যেন ইতিহাসের জীবনকেই স্পর্শ করেছেন। আর এই ইতিহাসে কল্পনাকে পাঠাবার কৌশল হিশেবে ব্যবহার করেছেন জাতিস্মর প্রসঙ্গ।

বিষকন্যা গল্পের কালপট কথকের অনুসারে “ন্যূনাধিক চব্বিশ শতাব্দী পূর্বের কথা।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৫) গল্পে মগধের মাৎস্যন্যায় পর্বের সুযোগ নিয়ে ইতিহাসে বিস্মৃত, পুরাণে অনুপস্থিত শিশুনাগবংশীয় রাজা অশ্রুতকীর্তি ‘চণ্ড’ ও তার সময়কে দেখানো হয়েছে।

‘বিষকন্যা’ গল্পের প্রধান চরিত্র হিশেবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্কা উপস্থিতি। তার আমৃত্যু পর্যন্ত কাহিনি এই গল্পের বিষয়। গল্পের নামও করা হয়েছে তাকে মনে রেখে। কাহিনির কাল সুদূর অতীতে বিসর্পিত। লক্ষণীয়, চণ্ডকে নিয়ে গল্পের শুরু হয়েছে। লেখকের ইতিহাস-কল্পনা মগধের রাজবৃত্তকেই অবলম্বন করে পরিক্রমা করেছে। রাজ অশ্রুতপুত্রের কথা, রাজ

পারিষদবর্গের ইতিহাসের নাম মাত্র অবলম্বন করে তার ভিতরে স্থাপন করেছেন সে কালের উপযোগী কিছু চরিত্র। চরিত্রগুলি পটভূমির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিষকন্যা ‘উল্কা’, শিবমিশ্র, রাজা চণ্ড, মোরিকা প্রমুখ তার এই কল্পনালোকের চরিত্র।

এ গল্পে চণ্ডের ভূমিকা আংশিক, সে গল্পের সূচনাংশের সঙ্গে যুক্ত এবং পুরাণ-ইতিহাসে তার নাম পাওয়া যায় না। লেখক তাকে শিশুনাগবংশের কোনো মধ্যকালীন রাজা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার নির্ধূর অত্যাচারী চরিত্রের কার্যকলাপ এগুলোর পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্ম দিয়েছে। গল্পে বর্ণিত চণ্ডের রাজ অন্তঃপুরে মোরিকা নামী একজন দাসী চণ্ডের ঔরসজাত একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। জন্মের পর কন্যার ভাগ্য গণনা করে পণ্ডিত দেখলেন এই কন্যা হবে অতিশয় কুলক্ষণা এবং প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী — সাক্ষাৎ “বিষকন্যা।”

এই সূত্রে চণ্ডের দু’টি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে —

প্রথমত, চণ্ড নিজের কথার উপর অন্যের কথা সহিতে পারেন না অর্থাৎ স্বৈরাচারী, স্বরাট। দ্বিতীয়ত, চণ্ড অত্যন্ত নির্ধূর ও হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। মন্ত্রী শিবমিশ্র চণ্ডের মতের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন তাই তাঁকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। নির্ধূর চণ্ডের প্রকৃতি জানেন বলেই পণ্ডিত সত্য কথা বলতে ভয় পেয়েছেন। স্পষ্ট কথা বলেই পণ্ডিত সন্ত্রস্ত হয়ে কম্পিত স্বরে বললেন — “উপস্থিত পিতা-মাতা সকলেরই অনিষ্ট-সম্ভাবনা রহিয়াছে। মঙ্গল সপ্তমে ও শনি অষ্টমে থাকিয়া পিতৃস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে।”

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে কন্যাটিকে বিষকন্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চণ্ড আদেশ দিয়েছেন কন্যাটিকে কন্যার মা নিজেই শ্মশানে পুঁতে দিয়ে আসবে। পণ্ডিত এরূপ নির্ধূর শাস্তিতে শঙ্কিত হয়েছেন কিন্তু মোরিকাকে রাজাদেশ পালন করতেই হয়েছে। চণ্ডের নির্ধূরতায় রাজান্তঃপুরের সকলেই সর্বদা ভয়ার্ত ও কম্পিত।

‘বিষকন্যা’ গল্পটির কাহিনিকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত যথা :

১) প্রথম পর্যায় : চণ্ডের ক্রুরতা ও হৃদয়হীনতার ছবি ফুটে ওঠে। শিবমিশ্রের কঠোর শাস্তি প্রদান ও নিজের ঔরসজাত কন্যা ও কন্যার মাতার নির্ধূর শাস্তি ঘোষণা।

২) দ্বিতীয় পর্যায় : মহাশ্মশানে শিবমিশ্রের সঙ্গে মোরিকার দেখা হওয়ায় ছাড়া পাওয়া। শিবমিশ্রের কন্যাগ্রহণ, রাজ্য ছেড়ে যাওয়া ও মোরিকার মৃত্যু। (লক্ষণীয়, এসব প্রসঙ্গ আদ্যন্ত কাহিনির সংযোগ সেতু রচনা করা)

৩) তৃতীয় পর্যায় : উল্কা ও সেনজিতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, পাঠকের ঔৎসুক্য ও চরমতমক্ষণ ও ক্রম পরিণতি।

‘বিষকন্যা’ গল্পের ক্রিয়ার সূচনায় চণ্ডের ভূমিকা এই পর্যন্ত। এরপর কাহিনীতে চণ্ডের কোনো ভূমিকা নেই। কাহিনীর স্থানও মগধ থেকে বৈশালীতে সরে গেছে। কাহিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের যোগসূত্র শিবমিশ্র এবং বিষকন্যা। শ্মশানেই শিবমিশ্র তাকে উল্কা নাম দিয়েছে। তারপর মগধ রাজ্য ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী লিচ্ছবিদেশে পলায়ন করেছে। শ্মশানেই মৃত্যু হয়েছে মোরিকার। মোরিকার মৃত্যু এখানে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এরপর দীর্ঘকাল নিঃশব্দে প্রস্তুতি চলেছে। সেখানে শিবমিশ্র প্রতিশোধপরায়ণ পিতা, অস্ত্র বিষকন্যা উল্কা। শিবমিশ্র চরিত্রের নির্মাণে কোথাও যেন চাণক্যের ছায়া লক্ষ করা যায়। শিবমিশ্র চণ্ডের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই উল্কাকে তৈরি করেছে। কিন্তু কাহিনীর প্রথম অংশের সঙ্গে শেষ অংশের প্রকৃত ক্রিয়াগত ঐক্য বা Unity of action নেই। প্রথম অংশকে মূল কাহিনীর উপক্রমণিকা বলা যেতে পারে মাত্র।

গল্পের শেষাংশটিই মূল উপজীব্য বিষয়। শিবমিশ্র উল্কার জীবন কথা প্রকাশ করে তাকে বৈশালী থেকে মগধে দৌত্যকার্যে পাঠায়। এত অল্প বয়সী যুবতী কোনো নারীকে দৌত্যকর্মে নিয়োগ সেকালের লিচ্ছবি রাজ্যের পক্ষেও সম্ভব কিনা শরদিন্দু সে প্রশ্নে মন দেন নি। তিনি বরং বৈশালীর গণতন্ত্রের কথা মনে করে যে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথাটিকে এর কৈফিয়ৎ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শরদিন্দু কিন্তু উল্কার চরিত্রকে উজ্জ্বল রূপে, সক্রিয়রূপে দেখাতেই এই কৌশল অবলম্বন করেছেন।

ইতিহাস রোমাঞ্চ রচয়িতার ধর্মই এই যে তিনি সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মানতে চান না। ফলে শিবমিশ্রের সমস্ত পরিকল্পনা উল্কা শুনেছে। পুরুষ চিত্ত জয় করে তাকে হত্যা করা তার পক্ষেও অসম্ভব বলে মনে হয়নি। রোমাঞ্চ রসের রচনাগুলির মধ্যে চরিত্র রচনা অপেক্ষা কাহিনী রচনার কৌশলই গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শী উল্কার পক্ষে একাজ যে কত দুরূহ তা লেখক বা মন্ত্রী শিবমিশ্র কেউই ভাবেন নি। উল্কাও নয়। রাজা সেনজিতের হৃদয় জয় করা এবং তার কণ্ঠলগ্না হওয়া উল্কার পক্ষে সহজ ব্যাপার। তারা কেউই একাজের গুরুত্ব ভেবে দেখেননি — অসফল হওয়ার সম্ভাব্য দিক প্রশ্নের মধ্যেই আনেন নি। উল্কা অসংকোচে প্রশ্ন করেছে ‘কবে যেতে হবে’? আর শিবমিশ্র উত্তরে বলেছেন আগামীকাল তোমার যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্কার মতামতের প্রয়োজন হয়নি। ফলে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা আসেনি। সব ঘটনাই সরল সহজ এবং ঋজু গতিতে বয়ে চলেছে। ষোড়শী উল্কার কথায়— সে ‘বিষকন্যা’ — এই টুকু মাত্র নয়। সে একাকী চলতে সমর্থ। সেকালের রাজপথে দস্যু তস্কর এবং নানা শ্রেণীর সৎ-অসৎ মানুষের অভাব ছিল না। কিন্তু উল্কা সঙ্গী সহচরদের অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী বনপথে যাত্রা

করেছে। যেন বনপথ কেবল কুসুমাস্তীর্ণ। উল্কা বলেছে “আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ।” সাজসজ্জাও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই উপযুক্ত। সে যে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ তার প্রমাণ হিসেবে অশ্বারোহী এক বনরক্ষীর সঙ্গে তার কথায় এবং আচরণে লেখক প্রমাণ দিয়েছেন। এবং আমাদের মনে যেটুকু সন্দেহের দাগ দেখা দিয়েছিল তাও মুছে ফেলে সাহসিকা উল্কাকে রোমান্সের নায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উল্কা সাহসিকা। আর সাহসিকা বলেই তার পক্ষেই এই অভিযান সম্ভব হয়েছে। সাধারণ আটপৌরে নারীর সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না।

উল্কার বক্ষে ধর্ম, পাশে তরবারি, কটিতে খুরিকা, পৃষ্ঠে সংসর্পিত কৃষ্ণবেণী; কর্ণে মাণিক্যের অবতংস অঙ্গারের মত জ্বলছে। এ বর্ণনা বীরঙ্গনার নয় রোমান্সের নায়িকার। সে একাধারে অল্পশব্দে সজ্জিত কিন্তু শব্দ অপেক্ষা কটাক্ষেই মোহিত করতে বেশি আগ্রহী। উল্কা কীভাবে অতি সহজে সবার দৃষ্টির অলক্ষে চণ্ডকে বধ করে—তার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। রাজা চণ্ড হাত-পা হীন কুৎসিত মানুষ এমনকি লোক চক্ষেও নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু রাজ প্রাসাদের সম্মুখে চণ্ডকে নিঃশব্দে হত্যা করাও যথেষ্ট বিস্ময় উৎপাদক। উল্কার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎও যথেষ্ট চিত্তোন্মোদকারী। রাজসভা বর্ণনায় শরদিন্দু সব সময়ই কৌতুকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা সেনজিৎ মধ্যাহ্নে অলসভাবে বয়স্যদের সঙ্গে বিদূষকের স্থূল রসিকতা শুনে সময় কাটাচ্ছিলেন। এ রীতি সংস্কৃত কাব্য নাটকের রীতি। উল্কার সঙ্গে প্রথম দেখাতে রাজার মনেও কৌতূহল দেখা দেয় এবং বিদূষকের সঙ্গে তার আচরণও যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বলেই সন্দেহ জাগে।

রাজা সেনজিৎ ও উল্কার পূর্ব রাগের সূত্রপাত মূলত—রাজহস্তী পুঙ্করের ক্ষেপে যাওয়া ও রাজা সেনজিতের দ্বারা প্রচণ্ড মদমত্ত উদ্যতশুণ্ড উন্মত্ত হাতিটিকে শাস্ত ও সংযত করার কাহিনিকে ঘিরে। গল্পকারের বর্ণনায় — “কয়েক মুহূর্তমধ্যে ধ্বংসের মূর্তিমান বিগ্রহ যেন শান্তিময় তপোবনমূগে পরিণত হইল।” এই মুহূর্তটি — ‘উল্কার মনে গভীর রেখাপাত করিল।’ তারপর ধীরে ধীরে সেই প্রেম এগিয়েছে শুকপাখি বিশ্বোষ্ঠকে আশ্রয় করে। বিশ্বোষ্ঠ রাজার দেওয়া নাম। সেই পাখিটি পক্ষীশালা থেকে আমলকী গাছে উড়ে এসে বসেছে। তাকে পুনরায় বাকে আনবার জন্য রাজা বেরিয়েছেন। উল্কা রাজাকে অস্তঃপুরে আসতে দেখে নিজেও এসেছে এবং শুক পাখিটিকে পাকরাও করেছে। পক্ষীটির নখের কয়েকটা আঁচড় রাজার গায়ে লাগে। তাতে উল্কা আকস্মিক ভাবে রাজার কাছে গিয়ে মুখ দিয়ে সে বিষ তুলে ফেলে দেয়। এখানে স্মরণে আসে আধুনিক নায়ক-নায়িকা সমব্যথী হওয়ার ঘটনা— “দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর তাহার কোমল অধরপল্লব স্থাপন করিল।” এ একটা সুযোগে উল্কা রাজার খুব কাছে চলে আসে। কিন্তু রাজা এতে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান। মনে হয় উল্কার প্রতি তাঁর গোপন প্রণয়ের কথা

তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি নিজেকে সংযত করে ফিরে যান। লেখক উভয়ের প্রণয়াকর্ষণ দেখাবার জন্য দু'টি কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন— এক. রাজহস্তী পুঙ্কর এবং দুই. রাজপক্ষী বিষ্মোষ্টের কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। লেখক তাঁদের প্রণয়ের পূর্বাভাস দিয়েছেন এভাবে — “দুই পক্ষী কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিল। তারপর বিষ্মোষ্ঠ অবজ্ঞা সূচক একটা শব্দ করিয়া উষ্কার কর্ণবিলম্বী রক্তবর্ণ কুরুবক-মুকুলে চপুঃ বসাইয়া টান দিল।” এখানে উষ্কার পক্ষীধরার কাহিনির আড়ালে আছে রাজা সেনজিতকেই নিজের আয়ত্তে আনার ঘটনা। পক্ষীমিলনের পাশাপাশি লেখক নারী-পুরুষের প্রেম-প্রণয় ও মিলনই কাম্য লেখকের।

মহারাজ সেন জিতের ছিল অদম্য সংযম ও কঠোরতা। নিজ কর্তব্যে অটল মানুষ। তাই মহারাজ সেনজিৎ আত্মবিস্মৃতি জয় করে কঠোর সংযমের শাসনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করলেন। সেনজিতের আত্মসংযম হওয়ার পেছনে একটিমাত্র পূর্ব নির্দিষ্ট রূপক পাওয়া যায়। সে পুঙ্করকে বশ করবার কাহিনি। পুঙ্কর এখানে রাজচিন্তের প্রতীক রূপ। সেই চিত্ত উষ্কারে দেখে ভিতরে ভিতরে মদ বিহুল এবং অসংযত হয়ে পড়েছে। তারই ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থাপনা দেখি প্রমত্ত পুঙ্করের ঘটনাটিতে। রাজা নিজের সেই সংযমহীন মনকে এভাবেই বশে এনেছেন। কঠোর সংযমের দিনে রাজার মনে যে উৎকর্ষা তার কিছু পরিচয় এতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে জানা যায় উষ্কা কোনো কুটিল উদ্দেশ্যে মগধে এসেছে। তার রূপমোহে আত্মলীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। রাজা সেনজিৎ দোটানায় পড়েন। তাঁর সরল সুখ ও মুখের প্রসন্ন হাসি এক নিমেষে উঠে যায়। তার উৎকর্ষা বেড়ে যায়, পাঠকদের সঙ্গ তার পছন্দ হয় না। তিনি বসন্ত উৎসবের রাতে অজ্ঞাত সস্তাপের আগুন বুকে নিয়ে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে বৈশালী নন্দিনীর উগ্রআহ্বান তার বুকে এসে ধাক্কা লাগে। উষ্কা কণ্ঠে গান শোনা যায় তাতেও পরিষ্কার হয়ে ওঠে সেনজিতের প্রতি তার প্রেমানুরাগ। অভিমানহতা নারীর আত্মধিকৃত এই সঙ্গীত সেনজিৎ ও উষ্কার যুগপৎ অনুরাগ ও হৃদয় যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেনজিৎ পৌরুষদীপ্ত বজ্র কঠিন কিন্তু উষ্কার প্রণয়ে তা কীভাবে তরল হ'ল এবং নারীর প্রেমের স্পর্শে কঠিন অর্গল ভেঙে নারীর প্রেমে ধরা দিল—এই বিষয়টিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

আধুনিক ছোটগল্পের বাস্তবধর্মিতার দিক থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিষকন্যা’ (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) গল্পটিকে বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে না। এখানে গল্পকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছে গল্পে বর্ণিত রমণীয় ঘটনা। কাহিনির পরিসর এখানে সুদীর্ঘকালের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করেছে।

কথাসাহিত্য সত্ত্বারে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গল্পটির নাম উল্লেখ করা অসমীচীন হবে

না। অনাবিল প্রেমের গল্পও বলা যায়। কারণ লেখক এখানে জাতিস্মর, ইতিহাস, প্রতিহিংসা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও উস্কা-সেনজিতের প্রণয় ও তার পরিণতির 'ট্রাজিক' মহিমাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। সংক্ষিপ্ত সময় পটে একটি ঘটনার একমুখী বর্ণনার পরিবর্তে এখানে কাহিনি স্পষ্টত দুটি কালপটে দুইশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর জীবনাশ্রয়ী হয়ে ব্যক্ত হয়েছে। শরদিন্দুর গল্পে একমুখী কাহিনি বিন্যাসের উদাহরণ অনেক আছে। 'চুয়াচন্দন' তার একটি উদাহরণ। কিন্তু 'বিষকন্যা' গল্পে লেখক অতীত ইতিহাসের একটি পর্বকে জীবন্ত করে তুলেছেন। রাজপরিবার কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্র, অত্যাচারী রাজাদের জীবনযাপন প্রণালী সেকালের রাজ অন্তঃপুরের পরিস্থিতি, রাজন্যবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির উত্থান এবং সর্বোপরি অত্যাচারীর হাতে পীড়িতের প্রতিশোধ স্পৃহা এগল্পে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সবই ঘটেছে কাহিনির মনোরম উপস্থাপনা কৌশলে এবং দূর ইতিহাসের পটভূমিতে। লেখক যেন সেই অতীত ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকার অন্তরাল ঈসৎ উন্মোচিত করে সেকালের জীবনের নানা বিড়ম্বনাকে একালের মানুষের চোখে কিঞ্চিৎ মায়াময় করে উপস্থিত করেছেন। কাহিনির মূল লক্ষ্য প্রতিশোধ স্পৃহা; চণ্ডের ঔরসে যে বিষকন্যার জন্ম সেই চণ্ডবংশকে সমূলে উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজেই প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রতিশোধের নির্ধূরতা অপেক্ষা প্রেমের লাভণ্যময়তা এ গল্পে অধিক মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। বিষকন্যা উস্কার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তা চরিতার্থতার উপায় সেনজিতের সঙ্গে প্রণয় পাশে আবদ্ধ হওয়ার ভান করা। সেকালে বিষকন্যারা একালের গুপ্তচর বিদ্যায় পারদর্শী 'মাতাহারি'দের প্রাচীন রূপ। সম্ভাব্য এভাবেই তারা লক্ষ্য সাধন করত। লেখক সেই কাহিনির একটি সম্ভাব্য পরিণতি এ গল্পে তুলে ধরেছেন। চণ্ড অত্যাচারী রাজা। প্রজাশক্তির হাতে তার যে শাস্তি হয়েছে তাও সেই সাধারণ মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহার একটি অভিব্যক্তি মাত্র।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা, রূপ এবং শ্রেণি নির্ণয় বিষয়ে আলোচ্য গল্পটির যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভবপর কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

গল্পটির কাহিনিতে দেখা যায়—

কমপক্ষে চতুর্বিংশ শতাব্দী পূর্বের মগধের রাজবংশের কথা, রাজান্তঃপুরের নর-নারীর প্রেম-প্রণয়-ভালোবাসা-ঈর্ষ্যা, প্রতিহিংসা, সিংহাসন দখলের লড়াই প্রভৃতি ঘটনা ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক। শুধু ইতিহাস নয়, কল্পনার আশ্রয়ে কাহিনি নির্মাণ বিষয়টিও উঠে এসেছে।

'বিষকন্যা' গল্পটি উস্কার ট্রাজিডি সংক্রান্ত। প্রচণ্ড উগ্রস্বভাব, প্রচণ্ড, প্রমত্ত রাজা চণ্ডের কন্যা জন্ম মোরিকা নামক এক দাসীর। ভাগ্য গণনায় ভাগ্য ফল হ'ল— এই কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা, প্রিয়জনের সাক্ষাৎ অনিষ্টকারিণী, বিষকন্যার রূপ তার রক্তের বীজানুতে।

পাণ্ডিত মুখে ভাগ্যফল নির্ধারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা চণ্ড দৈব বিপদের আশঙ্কায় মাতা ও বিষকন্যাকে বিসর্জন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। তদুপরি চণ্ড এতটাই নিষ্ঠুর যে, জন্মদাত্রী মায়ের হাতেই বিষকন্যাকে পুঁতে ফেলবার আদেশ দেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, বেহার (বর্তমান কুচবিহার) (১৪৪০-১৪৯৮) মন্ত্রীপুত্র মনোহর ও রাণী বনমালার গোপন প্রণয় সম্পর্কে রাজা কামতেশ্বর ঘোষণার কথা—

“ডেরু সহিত চোর নইল অন্দর।

রক্ষন করহ চোর কহে কান্তেশ্বর।।

বনমালাকু কহে পাকু কর য়েইক্ষণ।

চমৎকার হইয়া রাণী ভাবে মনে মন।।

নারীর পীড়িত দ্যেখ জীবন নিঃস্বফল।

ভণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী মঙ্গল।।

(রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী, গোসানীমঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৪, সম্পাদনা -
শ্রীহরিশচন্দ্র পাল, পৃ. ৯১)

অর্থাৎ অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত রাণীকে দিয়েই তার প্রেমিককে রেঁধে খাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এরকম পাশবিক ঘটনা শুধু আমাদের ভারতবর্ষেই নয়, বিদেশেও এই রকম ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—গ্রীক দেশের নাট্যকার ইসকাইলাসের ‘আগামেমনন’ নাটকটিতে দেখা যায় থুয়েস্তস্কে নিজের পুত্রের মাংস খাওয়ানোর ঘটনা। এমনকি ল্যাটিন ও গ্রীকদেশের বহু পৌরাণিক কাহিনীতে এসব ঘটনার কথা জানা যায়। আসলে রাজ আমলে এসব ঘটনা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাই তাদের কাছে এরূপ ঘটনা তুচ্ছ মনে হয়। যখন তখন বিনা দ্বিধায় এ ধরনের নির্দেশ বা ঘোষণা অন্তত তাই মনে করায়। সুতরাং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকুকে কাজে লাগিয়ে পুরাণে অনুল্লিখিত রাজা চণ্ডের চরিত্র ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের তত্ত্বে এঁকেছেন।

রাজা চণ্ডের হাতে লাঞ্চিত শিবমিশ্র সেই বিষকন্যাকে উদ্ধার করে লিচ্ছবি দেশে শ্মশান থেকে পালিয়ে যান। সেখানে মহাসচিব পদ গ্রহণ করে শিবমিশ্র রাজা চণ্ডের দুর্ব্যবহার ও প্রতাপ-দমনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিষকন্যাকে (শিবমিশ্রের প্রদেয় নাম উল্কা) চতুষ্টিকলাসহ ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। উপযুক্ত সময়ে উল্কাকে শিবমিশ্র নিজের এবং তার মা মোরিকার লাঞ্চিত ও প্রচণ্ড উৎপীড়নের কথা জানিয়ে উল্কার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালান। কালচক্রে রাজা চণ্ডের অত্যাচারে জর্জরিত প্রজারা বিদ্রোহ করে রাজা চণ্ডকে জগুঘা পর্যন্ত হাত-

পা কেটে সিংহাসনচ্যুত করে তোরণ পার্শ্বস্থ প্রাচীরের গায়ে এবং শিশুনাগবংশীয় উত্তর পুরুষ সেনজিৎকে চণ্ডের পরিবর্তে মগধের সিংহাসনে বসান। শিবমিশ্রের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য উষ্কা মগধের উদ্দেশ্যে রহনা দেয়। প্রথমে মৃগয়া কাননের রক্ষীকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে এবং পরে হস্ত পদহীন বন্দী চণ্ডকে নির্দিধায় হত্যা করে উষ্কার মতোই মগধের রাজাস্তঃপুরে প্রবেশ করে। অন্যদিকে শিবমিশ্রের যে অভিসন্ধি ছিল ‘কন্টকে নৈব কন্টকম্’ তা বাস্তবরূপ পেল না। কারণ উষ্কার চরিত্রের অভূতপূর্ব পরিবর্তন তথা মানসিক বিবর্তন। প্রতিশোধের অস্ত্রে দীক্ষিত উষ্কা সেনাজিতের প্রণয় মস্ত্রে দীক্ষা নিল। ভুলে যান শিবমিশ্রের কথা, ভুলে গেল প্রতিহিংসার কথা; প্রেম তার বড় পরিপন্থী সেখানে প্রতিহিংসার পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয়। আস্তে আস্তে রাজা সেনজিতও উষ্কার প্রণয়ে হাবুড়ুবু খেল। কিন্তু উষ্কার অন্তরে যে যন্ত্রণা কঠিন শিলার মতো চেপে বসে আছে সে কথা সে ভুলতে পারছে না। সে বিষকন্যা। তার স্পর্শে প্রেমিকের অমঙ্গল অনিবার্য তাই সে শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের মঙ্গলার্থে নিজের জীবনকেই বলি দিয়েছে। এখানেই চরিত্রটি সার্থক ট্রাজিক মহিমায় উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ‘মৃৎপ্রদীপ’ গল্পের সোমদত্তার সঙ্গে উষ্কার তুলনা চলে।

বলা যায়, বিপ্রতীপতার নিরিখে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বকেই গল্পকার চরিত্র দুটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

জন্মান্তর প্রসঙ্গ ইতিহাসের স্থাননাম, প্রতিবেশ, চরিত্র প্রভৃতি প্রসঙ্গ উল্লেখে গল্পটি ইতিহাসাশ্রিত গল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সর্বোপরি, “বিষকন্যা” গল্পটিকে প্রেমের গল্প বললেও অত্যাঙ্কি হবে না।

ঘটনাশ্রয়ী এই গল্পটিতে ছোটগল্পের শর্তগুলি যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি ‘মহামুহূর্ত’ বা ‘চরমতমক্ষণ’ (climax) সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য ‘বিষকন্যা’ গল্পটিতে লেখক ‘মহামুহূর্ত’ সৃষ্টিতে ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনাধর্মীতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

“দীপের তৈল ফুরাইয়া আসিতেছে; আকাশে চন্দ্রও ক্ষয়িষুঃ। বিষকন্যা উষ্কার বিষদন্ধ কাহিনী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

নিশীথ প্রহরে মহারাজ আসিলেন। উষ্কা পুষ্প-বিকীর্ণ বাসক গৃহের মধ্যস্থলে একাকী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হস্তে একগুচ্ছ কমল-কোরক।

সেনজিৎ তাহাকে দুই বাছ দিয়া জড়াইয়া লইলেন। কমল-কোরকের গুচ্ছ উভয় বক্ষের মাঝখানে রহিল।

‘উষ্কা’ — প্রাণময়ি —’ বিপুল আবেগে উষ্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া

ধরিলেন। তাঁহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন — আনন্দ-বেদনা।

উল্কা তাঁহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল — ‘প্রিয়তম, তোমার বাহুবন্ধন শিথিল করিও না। এমনভাবে আমায় মরিতে দাও।’

সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পূর্ণ মিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি বারিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ছুরিকা উল্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহারই বক্ষ-নিষ্পেক্ষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সেনজিৎ উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিলেন —

‘উল্কা! সর্বনাশী! একি করিলি? ... উল্কার মুখের হাসি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া

আসিল, চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল; — সে অতিক্ষীণ নির্বাপিত স্বরে বলিল — ‘প্রাণাধিক, আমি বিষকন্যা — ’

গল্পটি আধুনিক ছোটগল্পের ছাঁচে ফেললে আধুনিক পাঠক হয়তো হাল আমলের আধুনিক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন না তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে, ছোটগল্পের আবেদনের দিক থেকে ‘বিষকন্যা’ গল্পটি পাঠকের কাছে আধুনিক ছোটগল্পরূপেই ধরা দেবে। ঘটনার ঘনঘটা, অতিরঞ্জিত ভাব-প্রকাশ, কাহিনির সুবিস্তৃত পট গল্পটির একমুখিনতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ করলেও গল্পটির ভাবের যে ঐক্য অর্থাৎ সারকিট আইডিয়া ভাষার জাদুতে তা রক্ষা পেয়েছে। কথাকার গল্পটি বর্ণনায় বিবৃতিমূলকতার পাশাপাশি ইঙ্গিতের (Suggestiveness) সাহায্য নিয়েছেন। তাই ভাষা হয়ে উঠেছে ভাব-প্রকাশের যথোপযুক্ত মাধ্যম — যা গল্পখানিকে সার্থক পরিণতির দিকে তরতর করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এছাড়াও প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক যে তৎসমবহুল, সংস্কৃত মূলক ভাষা-ব্যবহার করেছেন তা ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষাকেই মনে করায়।

কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের অনেকটা অতিবাহিত করেছিলেন সময়ই উত্তর-প্রদেশের জৌনপুরে এবং বিহারের মুঙ্গেরের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বলা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ইতিহাস, আধ্যাত্মিক জীবন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর কৌতূহল। এই ইতিহাস ঘেঁষা বিষয়গুলি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় স্থান করে নিয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রতিবেশ তৈরি করেছিলেন। ‘বিষকন্যা’ গল্পটিতেও মগধের শিশুনাগবংশের ইতিহাস এবং সমসাময়িক কাল, পাত্র-পাত্রী প্রভৃতি বিষয় জায়গা করে নিয়েছে।

এই গল্পটি রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি গল্পকার কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন। চণ্ড-মোরিকা মিলনের ফসল হ’ল বিষকন্যা। চণ্ড-মোরিকা-বিষকন্যা উল্কা লেখকের কল্পনা প্রসূত। বিষকন্যাকে কেন্দ্র করেই গল্পের অভিমুখ তৈরি হয়েছে। বিষকন্যা প্রকৃত অর্থে বিষকন্যা কিনা তা

গল্প পাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাসচিব শিবমিশ্রের প্রচেষ্টায় উল্কা পিতৃহস্তারক হয়ে উঠেছিল। জিঘাংসাবৃত্তি তার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন শিবমিশ্র। উল্কা প্রকৃত বিষকন্যা কিনা তার প্রমাণ গল্পে নেই। কন্যার ভাগ্য গণনা করে তাকে বিষকন্যা বলা হলেও আমরা তার সেরকম ভূমিকা লক্ষ্য করি না। মগধের রাজাস্তম্ভপুত্র প্রবেশ করে উল্কা যেন বিষকন্যা থেকে নবজন্ম লাভ করেছে। কারণ, যে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উল্কা এসেছে— তা আর নেওয়া হয়নি। উল্কার মনে রাজা সেনজিতের প্রতি প্রেমানুরাগ জন্মেছিল। আর সে অনুরাগ ছলনা ছিল না। তাই সেনজিতকে সে হত্যা করতে পারে নি—নিজেই প্রেমের টানে ধরা দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলো। বলা যায়, উল্কা বিষকন্যা নয়, কারণ, আমরা বলতে পারি কোনো শিশুই বিষকন্যা হয়ে জন্মায় না। আর উল্কার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাই-ই প্রমাণিত হয়েছে।

‘বিষকন্যা’ মূলত গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সেতু’ (১৭ই চৈত্র ১৩৪৩) গল্পটির পটভূমি প্রাচীন ভারতবর্ষের বৃক্ক শকজাতির বর্বরতা ও উদামতার কালপর্ব। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে কল্পিত এই গল্পটির সময়সীমা। কুশানযুগের শকবাহিনীর একজন সৈনিক তথা পত্তিনায়ক অহিদত্ত রঞ্জুল ও উজ্জয়িনীর প্রখ্যাত শস্ত্রশিল্পী বৃদ্ধ তপুর্ মধ্য রঞ্জা নামী এক উদ্ভিন্নযৌবনা, পরমাসুন্দরী ও কুহকিনী নারীকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে অসিযুদ্ধের অবতারণা। গল্পটির আখ্যান বস্তুর দিকে নজর দিলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ‘সেতু’ গল্পটিতে একইসঙ্গে তিনটি বিষয় বর্ণিত আসা হয়েছে—

এক. অতীতের বর্ণনাময় জীবন, কামনা ও শক্তির দ্বন্দ্ব

দুই. অতীত ও বর্তমান জীবনের মধ্যে জন্মান্তরের সেতু রচনা

তিন. নারীর প্রতি আকর্ষণ, নারীহরণ ও নারীর জন্য লড়াই

দুই জীবনের সেতু রচনার জন্যই গল্পের নাম ‘সেতু’। এখানে গল্পের জোর এই সংযোগসূত্রের উপরে; এর ভিতরে আছে এক কামনাতাড়িত প্রেম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনি। শরদিন্দুর গল্পে প্রেম সবসময় বর্ণোজ্জ্বল এবং বাসনা বিভোল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনো সন্তোগ বাসনা-দীপ্ত কখনো সর্পিলা শীতল এবং ত্রুর। ‘রুমাহরণ’ গল্পে দুই নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সরাসরি নারীর অধিকার লাভের লক্ষ্য নিয়ে দুই প্রতিযোগী সমর। ‘সেতু’ গল্পে প্রেম অসম্পূর্ণ, কেবল বাসনা বিহুল পুরুষ নারীর রূপমাধুরীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ। নারীর কামনার উত্তাপ সম্পূর্ণ রূপে ধরা দেয়নি। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত ত্রুর এবং অনুজু। তপুর্ স্ত্রী রঞ্জার মোহিনী রূপের প্রতি অহিদত্তের যে বাসনাতাড়িত আকর্ষণ তারই ফলস্বরূপ তপুর্ অস্ত্র অহিদত্তকে হত্যা করে। এই কামনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে রয়েছে জন্মান্তরের কথা প্রসঙ্গ। এই অহিদত্তই দু’হাজার বছর পরে পুনরায়

জন্মগ্রহণ করেছে আজ থেকে ৩৫ বছর পূর্বে। হাল আমলে সে বিজ্ঞানের গবেষক — পুনর্জন্মে তার বিশ্বাস হয় না—আবার মানতে বাধ্যও হতে হয়। দুই জন্মের সেতুবন্ধন বর্ণনাই গল্পটির মূল উপজীব্য। লেখকের ‘সেতু’ গল্পটি ছাড়াও ‘রুমাহরণে’র মতো গল্পেও তিভিক্তিকৈ করায়ত্ত করবার জন্য দুই বলশালী পুরুষ গাঙ্কা ও ছড়ার লড়াই দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত এই নারীকে পাওয়ার লড়াই বিদ্যমান। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা বলশালী পুরুষেরাই নারীর ধারক ও বাহক। সুকৌশলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিস্মরতার সূত্র ধরে অতীতযুগকে বর্তমানের সঙ্গে সংযোগসূত্রে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। জাতিস্মর-জাতীয় গল্পগুলিতে কথাকার নানা পথে জাতিস্মরতায় প্রবেশ করেছেন। আলোচ্য ‘সেতু’ গল্পটিতে তিনি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে জন্মান্তরে প্রবেশ করে পর্যত্রিশ বৎসর পূর্বেকার জীবন-বৃত্তান্তের কথা জানতে পেরেছেন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের মায়াঘোরে। প্রাচীনকালের সঙ্গে নবীকালের সংযোগসূত্র তৈরি করতে তিনি স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দুই কালের সুদূর ব্যবধানকে ‘স্বপ্ন-সেতু’ দিয়ে গেঁথেছেন। কথাকারের ভাষায়— “হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল ... পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্ড্র স্বরে বলিল, ‘লিখে রাখ, ওরা চৈত্র ১ টা ১৭ মিনিটে জন্ম...’ রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদত্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধাবক তণ্ডু, লালসাময়ী রঞ্জা — একি স্বপ্ন? না আমারই মগ্ন চেতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত! পূর্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে? মৃত্যু জানি, কিন্তু সেইখানেই তো সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে শুরু ধরিয়া নূতন কোনো জীবন আরম্ভ হয় নাকি?” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯০)

কথকের স্বপ্ন দেখাটা কতটা বাস্তব সম্মত, কতটা অবাস্তব কতটা তার সম্বন্ধে সে নিজেই দ্বিধাগ্রস্থ কারণ, স্বপ্নটা হ’ল মৃত্যু থেকে পুনরায় জন্ম লাভ করা। এই গল্পে সে একজন বিজ্ঞানী তবু যে স্পষ্টভাবে স্বপ্নটা দেখা দেয় তাতে অস্বীকার করার কিছু থাকে না। কারণ বিজ্ঞানীর বস্তুমুখ্য দৃষ্টিভঙ্গি এই জন্মান্তর প্রসঙ্গ বিশ্বাস করে না। মানুষের এই জন্ম-মৃত্যু; মৃত্যু -জন্ম প্রক্রিয়াকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক — “বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ — ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত। মৃত্যুর পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিশ্বরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন এই বৈতরণীর উপর সেতু বাঁধিয়া দিল।”

যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি অলীক কল্পনার ধার ধারে না। এই গল্পে বক্তা স্বয়ং বৈজ্ঞানিক। আলোকরশ্মি সরলরেখায় চলে কিনা, এই বিষয় নিয়ে গত তিন বৎসর ধরে তিনি গবেষণা চালাচ্ছেন।

কঠিন পরিশ্রমে সে সেই গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। মুক্ত মনে ঘুমোতে ঘুমোতে জন্মান্তরের স্মৃতি ভেবে উঠেছে। আত্মকথন পরিস্থিতির ভঙ্গিতে লেখক গল্পটি বর্ণনা করেছেন ঠিকই কিন্তু গল্পটির সূচনাংশে ও শেষাংশে মধ্যম পুরুষবাচক কথনভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পটিতে কথক অহিদত্ত রঞ্জুল, অসিধাবক তণ্ডু এবং তণ্ডুর যুবতী পত্নী লালসাময়ী রঞ্জা। শস্ত্রশিল্পী তণ্ডু বৃদ্ধ অথচ অসিচালনায় এখনো সে অতীব দক্ষ। কথাকারের ভাষায় — “অসিতে অসি লাগিয়া স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একপদ হটিল না। আমি যোদ্ধা, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাঁহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের ন্যায় নিবীৰ্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।”

বৃদ্ধদের সুন্দরী তরুণী রমণীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছে পরপুরুষেরা। অপরপক্ষে ঐ মোহিনী নারীরাও পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। আলোচ্য ‘সেতু’ গল্পটিতেও সেই সত্য লক্ষণীয়। অহিদত্ত রঞ্জুল বৃদ্ধ তণ্ডুর লালসাময়ী স্ত্রী রঞ্জার প্রেমাকর্ষণে ধরা দিয়েছে। আর সেই ঘটনাকে ঘিরে বৃদ্ধের সঙ্গে পত্তিনায়ক যুবক অহিদত্তের অসি-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাস্তবিকই যুগ যুগান্তরের সূত্র ধরে খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে তা আজও বহমান। শরদিন্দুবাবু কৌলিন্য প্রথার ইঙ্গিত দিয়ে প্রবৃত্তিতাড়িত অসংযত পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই রূপ দিয়েছেন জাতিস্মরণ প্রকরণ কৌশলের আশ্রয়ে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত গল্পের মতো ‘সেতু’ গল্পটিতেও অতীতের প্রেক্ষাপটকে বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে বাস্তব-অবাস্তবের মায়ালোক রচনা করেছেন। নারীকে নিয়ে পুরুষের মদমত্ততা, আকর্ষণ, রপাসক্তি, চিত্তচাঞ্চল্যকর অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য ‘সেতু’ গল্পটিতে। প্রণয় বিলাসিনী রমণীর আকাঙ্ক্ষা ও ভোগাসক্তির অতৃপ্ত বাসনালোকের রূপ নির্মাণ গল্পটি অন্য একটি দিক। শুধুমাত্র ‘সেতু’তেই নয় তাঁর বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পে নারীদের এরকম ভূমিকায় দেখা যায়। বলাবাহুল্য, প্রকরণগত কৌশল-স্বাতন্ত্র্যের জন্যই ‘সেতু’ গল্পটি উৎকৃষ্ট গল্প। কথক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে জাতিস্মরণতায় প্রবেশ করে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। পূর্বজীবনে তার নাম ছিল অহিদত্ত রঞ্জুল। তিনি একজন শকজাতির পত্তিনায়ক, সেনাপতি। তণ্ডুর যুবতী স্ত্রীর প্রতি আসক্তির কারণে তণ্ডুর হাতে মারা যাওয়ার পর তার দেহমুক্ত আত্মার বিচরণকে কেন্দ্র করে প্রেতলোক ও মর্তলোকের যে কাঙ্ক্ষনিক সংযোগ-সেতু কল্পনা করেছেন তা এককথায় অবিস্মরণীয়। লোকোত্তর ভুবনে যাত্রার পর পুনরায় মর্তলোকে আগমনের বিষয়টির প্রাঞ্জল বর্ণনাও পাঠককের ঔৎসুক্য বাড়ায়।

নারী-পুরুষের আমোদ-প্রোমদের বর্ণনায় ‘বসন্ত-উৎসবে’র আয়োজন নারী-পুরুষের চিত্তে

প্রেম বিহীনতা ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগায়। প্রকৃতির পটভূমিকায় তা সত্যিই অনবদ্য। প্রকৃতি যেন উদ্দীপন বিভাব, নারী-পুরুষ আলম্বন বিভাব, নারী-পুরুষের প্রেমের আনন্দের উত্তেজনা বিভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বসন্তোৎসবকে সফল করে তোলে। নারী-পুরুষের মনে ব্যাকুলতা জেগে ওঠে। প্রকৃতি আর বসন্তোৎসব যেন একে অপরের পরিপূরক। লেখকের অন্যান্য গল্পগুলিতেও এই বসন্তোৎসবের নজির রয়েছে। বসন্তোৎসবের বর্ণনার পুরুষ-প্রকৃতির মিলন লীলার প্রেক্ষিতে ভাষাও হয়ে উঠেছে গুরু-গভীর, ধ্রুপদী, সংস্কৃতগন্ধী। ভাষাও যেন এই মহোৎসবের আনন্দের প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অহিদত্তের মনেও বসন্তোৎসবের মোহনীয় আকর্ষণ লক্ষণীয়। লালসাময়ী রত্নাকে সে বসন্তোৎসবের আনন্দময় পরিবেশে দেখে আকর্ষণ অনুভব করেছে। লেখকের ভাষায়— “একবার মাত্র তাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কঙ্কম-অরণিত সায়াহ্নে। উজ্জয়িনীর নগর উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই — লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরণ্য নেত্র তুলুতুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কঙ্কম-প্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুণুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনো মৃগনয়না বিভ্রমছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে — তুমি আমার চক্ষু কুক্কুম দিয়াছ! প্রণয়ী তরণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরণ্যভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কর্ণের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।”

মদনোৎসব মূলত নারী পুরুষের স্পর্শানুভূতিতে প্রেমের স্পর্শ উৎসব। নারী পুরুষের মনে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। এই মুক্ত মদনোৎসবে প্রকৃতি-পুরুষ মনের আনন্দে স্বাধীনভাবে কন্দর্পের মর্মর দেউলে নিজেকে সাঁপে দিয়ে প্রেম ও যৌবনের লীলা উপভোগ করে। অহিদত্ত রঞ্জুলও এই আনন্দ উপভোগ করার জন্য বসন্তোৎসবে যোগদান করেছে। তার চোখে লালসাময়ী রত্না ধরা দিয়েছে এভাবে — “তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তম্বী; কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণের কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে স্নান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লূতাজালের ন্যায় সূক্ষ্ম কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ চন্দ্রকলাকে

আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকৃষ্ণিত নিচোল; চরণ দুটি লাক্ষারস-নিষিক্ত।”

গল্পের কলাকুশলীদের রূপ-সজ্জা ও দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনায় লেখক অসাধারণ রূপদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যেন রূপের কারিগর; শব্দের ছলাকলায় ও তার নিপুণ প্রয়োগে দক্ষকুশলী। তাঁর এই কৃতিত্ব অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে এই ‘সেতু’ গল্পটি শকজাতির মদমত্ততার অন্তরালে নারী-পুরুষের বন্ধাহারা আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন। কাহিনিটি শুধু ইতিহাসের মোড়কে আবদ্ধ বটে; কিন্তু এর অভ্যন্তরে রয়েছে নারী পুরুষের দুর্জয়, দুর্বীর প্রেম। শেষ পর্যন্ত ‘সেতু’ গল্পটি একটি অতৃপ্ত প্রেমের গল্প হিসেবেই থেকে গেল।

‘মুৎপ্রদীপ’ গল্পটির কাহিনিতে পূর্বজন্মের কথা স্মৃতির সূত্র ধরে বর্ণিত হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ক্ষুদ্র জরাজীর্ণ মুৎপ্রদীপকে অবলম্বন করে বহুদূর অতীতের এক রাজাস্তম্ভপুত্রের, রাজপরিবারের জীবন-চিত্রের উত্থান-পতনের নিপুণ আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। সুকুমার সেনের মতানুসারে এই গল্পটির কালসীমা সম্ভবত চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে। সেকালের মানুষের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের, আশা-নিরাশার, প্রেম-অপ্রেম, প্রবৃত্তির উন্মত্ততা ও ষড়যন্ত্রের বাস্তব সম্মতরূপ গল্পটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পে উল্লিখিত যে পুরাতন মাটির প্রদীপটিকে নিয়ে গল্প ফাঁদতে শুরু করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন লেখক এভাবে —

“যে মুৎপ্রদীপের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহারই কথা ধরি না কেন। প্রাচীন পাটলি পুত্রের যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহারই চারিপাশে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে এই মুৎপ্রদীপটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। নিতান্ত একেলে সাধারণ মাটির প্রদীপের মতোই তাহার চেহারা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় কাগজের মতো পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার মুখের কাছটিতে একটুখানি পোড়া দাগ লাগিয়া আছে। এই নোনা ধরা জীর্ণ বিশেষত্ব বর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই উপস্থাপিত ক্ষুদ্র শিখার বহ্নিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল।”

কাহিনির উপস্থাপনায় লেখক কৌশল অবলম্বন করেছেন। পুরোনো দিনের কথা বলবার জন্য এই ভাবে কথা মুখ রচনা করে নিয়েছেন। পুরোনো দিনের গল্প বলবার এক একটা ভঙ্গি। কীভাবে অতীতের কথা কে বিশ্বাসযোগ্যরূপে বলা যায় — এ তারই একটা পদ্ধতি। একালের মানুষের চোখ দিয়ে দেখলে পুরোনো দিনের জীবনকথার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। কারণ আধুনিক মানুষের এই জাতিস্মরণীয় বিশ্বাস নেই ধরে নিয়েই এই কৌশল অবলম্বন করলেন। এতে অতীত চারণাও তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। তাই লেখক নিজেকে কথকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে তার পুরোনো

জন্মের স্মৃতিকথার কথা বলেছেন। আর এরকম উপস্থাপনার মধ্যে এক দিকে যেমন অতীতের রোমান্সের অন্তঃপুরে প্রবেশের চাবিকাঠি আছে, তেমনি আছে তার নাটকীয়তা। কথকের পুরোনো প্রদীপ খুঁজে পাওয়া এবং সেই সূত্রে পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ে যাওয়া এই আকস্মিকের যোগসূত্রে গল্প বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তার উপর শেষ বাক্যে যখন একটি রাজ্যপুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা বলে গল্পের foregrounding করা হয় তখন তা আকর্ষণীয়তার মাত্রা ছাপিয়ে কৌতূহলের কোঠায় গিয়ে পৌঁছে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, লেখক বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ কৌশলের মাধ্যমে সুদূর অতীতে জীবনের ভিতরে প্রবেশ করেছেন। ‘মৃৎপ্রদীপ’ তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

গল্পটিতে কথক পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে ক্ষুদ্র একটি মৃৎপ্রদীপ খুঁজে পান। ঐ মৃৎপ্রদীপটির গায়ে লেগে থাকা অতীত যুগের কাহিনি, পুরাবৃত্তের কোনো মসীলিপু অধ্যায়ের পুনরাবিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি চিন্তা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে অতীতের ধূসর স্বপ্নাবিষ্ট মায়ার জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছেন স্মৃতিপটের পথ বেয়ে বেয়ে। লেখক জানিয়েছেন — “প্রদীপ জ্বলিলে যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলাম, তখন নিমেষ মধ্যে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ঘটয়া গেল। স্তম্ভিত কাল যেন অতীতের সঙ্গী এই প্রদীপটাকে আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া রহিল। এই পাটলিপুত্র নগর মস্তবলে পরিবর্তিত হইয়া কবেকার এক অখ্যাত মগধেশ্বরের মহাস্থানীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। আর আমার মাথার মধ্যে যে স্মৃতিপুস্তকগুলি এতক্ষণ স্বপ্নের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা সজীব হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা — কত নগণ্য অনাবশ্যক কথা এই বার্তিকার আলোকে দীপ্তিমান জীবন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সম্মুখ হইতে বর্তমান মুছিয়া একাকার হইয়া গেল, কেবল অতীতের বহুদূর জন্মান্তরের স্মৃতিভাস্বর হইয়া জ্বলিতে লাগিল।” — প্রদীপ এখানে অতীত স্মৃতি জাগিয়ে তোলবার মাধ্যম। প্রদীপের আলোয় পুরাবৃত্তের মসীলিপু অধ্যায়কে উন্মোচিত করেছেন লেখক। পাটলিপুত্র নগর মস্তবলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এক অখ্যাত মগধেশ্বরের রাজধানীতে আর স্মৃতিপুস্তকগুলি ফিরে পেয়েছে প্রাণ। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ক্ষুদ্র এই মৃৎপ্রদীপটিই গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

তিনি তাঁর ঐতিহাসিক গল্পগুলি সম্পর্কে ডায়েরিতে কিছু কথা লিখে রেখে গেছেন তা প্রণিধানযোগ্য — “আমি আমার অনেকগুলি গল্পে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এইগুলি আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রেষ্ঠ হোক বা না হোক, আমি বাঙালীকে তাহার প্রাচীন -এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করেন না কেন? বাঙালী যতদিন না নিজের বংশ গরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার

চরিত্র গঠিত হইবে না; ততদিন তাহার কোনো আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।”^৭

তাঁর এই অভিপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। ‘বাঙালীর ইতিহাস চাই’ — এই ইতিহাস অনুসন্ধান এবং ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজ বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে কাজই করেছেন। বাঙালির জীবনকে প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করে তুলতেই এসব গল্প তিনি রচনা করেছেন। এই ধরনের কাজ উনিশ শতকের অনেক লেখকই করেছেন, তবে বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত তার বিস্তার খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। শরদিন্দু ইতিহাসের যে পট উন্মোচন করে দেখিয়েছেন তার কালপর্বও কম নয়। ‘মুৎপ্রদীপ’ গল্পের কালভূমি আজ থেকে ষোল শতাব্দী আগেকার। অন্যান্য গল্পগুলি এই সঙ্গে দেখলে দীর্ঘ একটা কালপট আলোকিত করে তোলবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাল সীমা শরদিন্দুর এই গল্পগুলির পটভূমি। ‘মুৎপ্রদীপ’ গল্পটিতে লেখক চতুর্থ শতকের আলো-আঁধারি ভিতর থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নামমাত্র অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজপরিবারের একটি রূপ রচনা করেছেন। যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, প্রেম-প্রবৃত্তি এই গল্পটির মূল উপাদান। এর কাহিনি অতি সামান্য। রাজা চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে শ্যালকের সাহায্যে যে রাজ্যলাভ করেছিলেন তাতে কুমারদেবীই হয়ে উঠেছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী। ইতিহাসের পাতায় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহ সম্পর্কে যে কথা পাওয়া যায় লেখক সেই কাহিনিকে অনুসরণ করে চলেছেন। কুমারদেবী যে লিচ্ছবিবংশীয় ছিলেন ঐতিহাসিকেরা অনেকেই তা স্বীকার করেছেন। সমুদ্রগুপ্ত ‘লিচ্ছবি-দৌহিত্র’ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ, বৌদ্ধযুগ, হিন্দুযুগ ইত্যাদি প্রাচীন কালের এই পর্বগুলি যেমন আমাদের কৌতূহল জাগায় তেমনি সুদূর অতীত জীবন সম্পর্কেও নিবিড় ঔৎসুক্যবোধ জাগ্রত করে। আর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সব গল্পের বিস্তার।

গল্পটিতে ইতিহাস নামমাত্র, লেখকের কল্পনার আতিশয্য বেশি। লেখক ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে অনেকটাই সরে এসে সেকালের রাজপরিবারের জীবন কেমন হওয়া সম্ভব ছিল, বা কেমন হতো তা নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন — “মুৎপ্রদীপের আখ্যান বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক কেবল কুমারদেবী, চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রবর্মা, সমুদ্রগুপ্ত এই নামগুলো ঐতিহাসিক। চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয় যাত্রাও সত্য ঘটনা।”^৮

অপেক্ষাকৃত হীনবল বংশের উত্তরসূরী ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং লিচ্ছবিবংশের কুমারদেবীকে বিবাহ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ছিলেন একথাও ইতিহাসে থেকে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকদের কারো কারো মতে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব-পুরুষেরা খুব বড়দের রাজা ছিলেন না। লিচ্ছবিবংশে বিবাহ করবার পর তাদের উত্থান ঘটে। চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী লিচ্ছবিবংশীয় কুমারদেবীকে গল্পে শাসনকর্ত্রীরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। ইতিহাসে বলা হয় “She ruled by her own right at the sovereign of the lichchavis.”^{১০} চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁর ছবিও পাওয়া গেছে। মুদ্রার অপরপীঠে লক্ষ্মী মূর্তি সিংহের উপর আসীন আর তাতে ‘লিচ্ছবয়’ কথাটি উৎকীর্ণ আছে। এতে কুমারদেবীকে লিচ্ছবিবংশীয় বলে মনে করবার কারণ আছে। রোমিলা থাপার সম্ভবত লিখেছেন, গুপ্তবংশ চন্দ্রগুপ্তের আগে কোনো ধনী ভূম্যধিকারী পরিবার ছিল, লিচ্ছবি কন্যাকে বিবাহ করবার ফলে তাদের সম্মান বাড়ে। এছাড়া লিচ্ছবি বংশীয় কন্যারা ক্ষমতাকেই বেশি পছন্দ করেন এবং শাসনকর্ত্রীক হতে চান। (ভারতবর্ষের ইতিহাস, বঙ্গানুবাদ, কৃষ্ণ গুপ্ত, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১০০)

শরদিন্দু ইতিহাসের এই তথ্যগুলি সবই রক্ষা করেছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য শাসনে কতটা ক্ষমতা ভোগ করতেন ইতিহাস থেকে তার তথ্য পাওয়া যায় না। কাজেই লেখক এখানে কাহিনি নির্মাণে কল্পনার সুযোগ নিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে স্ত্রীর অধীন রূপে উপস্থাপিত করেছেন। গল্পকারের কথায়— “পটমহাদেবী লিচ্ছবি দুহিতা কুমারদেবীর দুর্ধর্ষ। প্রতাপে চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলিতে পারিলেন না। রাজমুদ্রায় রাজার মূর্তির সহিত মহাদেবীর মূর্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার নামে রাণী স্বেচ্ছামত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ... চন্দ্রগুপ্ত বীর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার আত্মাভিমাণে আঘাত লাগিল।” ইতিহাসের পাতায় যে কথা লেখা নেই সেখানে শরদিন্দু নিজের কল্পনা শক্তির সহায়ে কাহিনির রূপ দিয়েছেন। রানী কর্তৃত্ব ভোগ করতেন। সুতরাং রাজা দুর্বল ছিলেন — এই অনুমান করে লেখক চন্দ্রগুপ্তের আত্মাভিমাণের কথা তুলেছেন।

কাহিনি গড়ে তোলবার জন্য শরদিন্দু চন্দ্রগুপ্তের আত্মাভিমাণ এবং লিচ্ছবি রাজকন্যার কর্তৃত্বের কথা বলে রেখেছেন। এতে তৃতীয় একটি সম্ভাব্য কাহিনির শাখা গড়ার ক্ষেত্রে তার সুবিধে হয়েছে। শরদিন্দু এই গল্পে ইতিহাস লিখতে চাননি। ইতিহাস তাঁর পটভূমি মাত্র। চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী লিচ্ছবি কন্যার স্বাতন্ত্র্য গর্ব চন্দ্রগুপ্তের আত্মাভিমাণ ক্ষুণ্ণ করেছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু অকুলীন ভূম্যধিকারীর বংশ লিচ্ছবি রাজশক্তির সংযোগে এক প্রধান রাজশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত ১৪/১৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। আর কল্পনা নির্ভর এই আখ্যানটি গড়ে উঠবার মূলে গল্পে যে প্রদীপ কুড়িয়ে পাবার কথা আছে সেই ঘটনাটি সত্য। শরদিন্দু নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। কুমরাহারে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি নিজেই একটি পুরোনো মাটির প্রদীপ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেটিই এই কাহিনি কল্পনার আদিসূত্র।

কল্পনামূলক কাহিনি রচনায় লেখকের স্বাধীনতা আছে। কেবল লক্ষ করবার বিষয় কল্পনাও ইতিহাসানুমোদিত কিনা।

আত্মাভিমানবশত চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর স্বতন্ত্র প্রয়াসে এবং লিচ্ছবি শক্তির প্রভুত্বগর্বে ক্ষুণ্ণ হয়ে রাজ্য শাসন কর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। মহাদেবীই রাজ্য শাসন করতেন। প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে ধরে নিয়ে লেখক গল্প তৈরি করেছেন। এরকম সম্ভাবনার সত্যতা চন্দ্রগুপ্তের বীরত্ব গর্বকেই ক্ষুণ্ণ করে। সমুদ্রগুপ্তের পরিচয়ে ‘লিচ্ছবি-দৌহিত্র’ শব্দটির ব্যবহার সম্ভবত গুপ্তরাজবংশের অর্বাচীনতা এবং লিচ্ছবিবংশের গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্যের স্মারক। তবে দুই নারীর দ্বন্দ্ব বিরোধ এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই -এ চন্দ্রগুপ্ত কেবল নিষ্ক্রিয় চরিত্ররূপে বিরাজমান একথা ইতিহাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে বলে মনে হয় না। এরকম সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আরও একটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে — কুমারদেবীর স্বাতন্ত্র্য খর্ব বিনষ্ট করে চন্দ্রবর্মার কন্যা সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার যে পরিকল্পনা করলে সেই অনুসারে সোমদত্তার পুত্রেরই রাজ্য লাভ করবার কথা। অথচ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর সমুদ্রগুপ্ত রাজা হয়ে নিজেকে ‘লিচ্ছবি-দৌহিত্র’ বলেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই বিষয়ে আরও যুক্তি দেওয়া সম্ভব কিন্তু একথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন কাহিনি ইতিহাস নির্ভর নয়, স্বকপোলকল্পিত রোমাঞ্চ মাত্র। লেখক এই রোমাঞ্চ রচনা করতে গিয়ে প্রেম ও প্রবৃত্তিকেই মূল বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কৌশলের আশ্রয় নিয়ে চন্দ্রবর্মা নিজের কন্যাকে রাজনৈতিক টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে সহজেই চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে তার কন্যা। এখানে চন্দ্রবর্মার চরিত্রে রাজনীতিকের পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে। পিতার পরিচয় বড় হয়ে উঠেনি। তাই এই প্রসঙ্গ টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রটিকে কেবল হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, কামুক এবং মদ্যপ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের এটুকু জ্ঞান অবশ্যই ছিল যে সেকালে গুপ্তচর বৃত্তিতে সুন্দরী রমণীদের ব্যবহার করা হত। শরদিন্দুর ‘অমিতাভ’ গল্পেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত কেবল কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য নারী দেহটিকে ব্যবহার করতে চাইলে তাকে রাজ অন্তঃপুরের বাইরে যে কোনো বিলাস-গৃহে স্থান দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। সম্ভবত এর পিছনে লেখকের দু’টি চিন্তা কাজ করেছে। এক. তিনি চন্দ্রগুপ্তকে কামবৃত্তি-তাড়িত এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন করে আঁকতে চান এবং দুই. এর পিছনে মহাদেবীকে নিচে নামানোর কোনো গূঢ় অভিসন্ধি তাঁর মনে থাকা সম্ভব। তবে নারীর ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যগর্ব ক্ষুণ্ণ করতে বীররাজা চন্দ্রগুপ্তকে এরকম পরিকল্পনা করতে হচ্ছে— এই ভাবনাটাও নির্ভুল নয়। গল্পটি এরকম দু-একটি পূর্ব সিদ্ধান্তের উপর জোর দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা বজায়

রাখা রাজা চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা অপেক্ষা লেখকের লক্ষ্য বিট চক্রায়ুধ ঈশানবর্মার পূর্ব স্মৃতি সূত্রে সেকালের ভোগ কলঙ্কিত নাগরিক জীবনের রূপকে অঙ্কন করা। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের বিলাসিতা মদমত্ততা যৌনতা ও অল্পপুরনারীদের ব্যর্থতা ও হতাশার চিত্রকে রূপ দেওয়া। চক্রায়ুধ ঈশানবর্মাই এগল্লের কথক আর তার স্মৃতি জাগরণে কাজ করেছে সেই প্রদীপটিই, একদিন সোমদত্তা পাটলি পুত্রের রাজগৃহে যে প্রদীপটি দিয়ে অগ্নি সংযোগ করেছিল। ঈশানবর্মা তখন ছিল রাজা চন্দ্রগুপ্তের পার্শ্বদ এবং ক্ষুদ্র এক ভূস্বামী। কথায় বলে—অভিমানহত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত মদ্যপান, মৃগয়া এবং নারী এই তিনটি বিলাসকেই জীবনে বেছে নেন যৌবনংবা বনংবা। চন্দ্রবর্মার কন্যা সোমদত্তা সেই মৃগয়ার মুখ্য শিকার যাকে নিয়ে কাহিনির প্রসারতা। চন্দ্রবর্মা সোমদত্তাকে রাজপুরীতে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করে পাটলিপুত্র নগর জয় করবার স্বপ্ন দেখেছেন। পরিকল্পনা ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের অবহেলিত জীবনের প্রতি গুপ্তচর সোমদত্তারই সহানুভূতিতে কাহিনির পরিণতি অন্যরকম হ'য়ে পড়ে। পিতা চন্দ্রবর্মাকে রাজ্য আক্রমণ করবার কথা সোমদত্তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ করে সে ক্ষমতা গর্বিত মহারানী কুমারদেবীর অবহেলা থেকে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল কিন্তু এই ভাবনার মূলে জল ঢালে বিট ঈশানবর্মা। এই নারীর রূপ তার মনকে তাতিয়ে তুলেছে। সে রাজধানীতে কর্তব্যরত অবস্থায় গুপ্তচর সোমদত্তাকে হাতে হাতে ধরে ফেলে এবং তাকে নিজের লোলহান কামনার বহ্নিতে দগ্ধ করে। কিন্তু সোমদত্তার অভিপ্রায় পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক ছিল না শুধুমাত্র সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তের কল্যাণের জন্য পিতাকে রাজ্য আক্রমণে সাহায্য করে তার কাছ থেকে রাজ্য চেয়ে নেবার কথা ভেবেছিল। অন্যদিকে লিচ্ছবি সৈন্যের সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করবার পরিকল্পনা এবং অবরুদ্ধ রাজপুরীতে গোপন পথে খাদ্য সরবরাহ করবার কথা জেনে নিজেই পিতাকে দ্রুত রাজ্য আক্রমণ করার কথা বলেন। রাজপুরীতে আগুন লাগিয়ে সে কুমারদেবী, রাজকুমার সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্তকে গোপনে নিষ্ক্রমণের পথ দেখিয়ে দেয়। বিট চক্রায়ুধের স্পর্শে হীনস্মন্যতায় অপমানে অপবিত্র দেহ নিয়ে সে আর চন্দ্রগুপ্তের কাছে ফিরে যেতে চায় না। কাহিনির এই অংশটি রোমান্সের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে। মাঝখানে সোমদত্তা পিতা চন্দ্রবর্মার প্রশ্নের উত্তরে বলেছে — “দেব এ ভিন্ন আমার আর অন্য পথ ছিল না। তিনি থাকিলে সকল কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে মরিয়াও আমার এ নরক যন্ত্রণা শেষ হইত না। পিতা, আমার কিছুই নাই — সব গিয়াছে। নারীর যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু প্রেয়, এক নরকের পশু তাহা হরণ করিয়াছে।” ঈশানবর্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক এ কাহিনির মধ্যে জটিলতা বাড়িয়েছে। ঈশানবর্মার কামনার স্পর্শে তার দেহ কলুষিত হবার ঘটনাটিকে কাহিনির মধ্যপর্যায় বলা যেতে পারে। সেখান

থেকে কাহিনি দ্রুত পরিণতির পর্যায়ে পৌঁছায়। সোমদত্তা নিজেই এই কাহিনির নিয়ন্তা। সেখানে সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়ার কারক সে নিজেই। চক্রায়ুধের কাছে অসহায় ভাবে বাধ্য হয়ে আত্মদান করার পর মুহূর্তেই তার পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির হয়ে যায়। নারীর ক্রিয়ার মূলে চিত্তবৃত্তির যে তীব্রতা, তার নির্দ্বন্দ্ব ইচ্ছার যে প্রবলতা এ গল্পের সমাপ্তিতে তারই রূপচিত্র পরিলক্ষিত হয়। সোমদত্তার ক্রিয়ার দ্রুতিতে লেখকের বর্ণনার দ্রুতির মধ্যে দিয়ে গল্পের শেষ অংশটিকে একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর, প্রেম ও প্রতিহিংসার বুননে শ্বাসরোধকারী পরিণতির টানে গতিময় করে তুলেছে। রাজপ্রাসাদে তখন আগুন জ্বলছে, সে আগুন সোমদত্তার ক্ষোভের ও আত্মদাহের, সে আগুনে ঈশানবর্মার কলুষিতচিত্ত পুড়ে গিয়ে সোমদত্তার প্রেমকে শুদ্ধ করে তুলেছে। রাজমহিষী কুমারদেবীর সঙ্গে তার তখনকার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। চন্দ্রগুপ্তকে জাগাতে ও চন্দ্রগুপ্তের সুপ্তিভঙ্গে এই দাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অত্যন্ত স্পষ্ট। স্বামীর বংশধরকে রক্ষা করবার তাগিদ তখন জীবনের শেষ লক্ষ্য। পিতা চন্দ্রবর্মা রাজধানী অধিকার করলে সোমদত্তা তাকে সবকথা জানিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক চক্রায়ুধের কথা চন্দ্রবর্মা আগেই জেনেছিলেন। রাজপুরীতে পা দিয়েই তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন— “তুমিই বিশ্বাসঘাতক দ্বারপাল।” ঈশানবর্মার কথা জানিয়ে সোমদত্তা বলেছে, এই নরকের পশু আমার সর্বস্ব হরণ করেছে। আর রাজ্য পিতার হাতে তুলে দেবার পুরস্কার স্বরূপ সে ঈশানবর্মার কঠোর শাস্তি চেয়েছে— “এই পিশাচকে এখনি মারিবেন না, ইহাকে তিলে তিলে দন্ধ করিয়া মারিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষকণ্ঠকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নরাধম পচিয়া পচিয়া মরে, গলিত ক্রিমিপূর্ণ শূকর মাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায়; মরিবার পূর্বে যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ-গলিয়া খসিয়া পড়ে। আমার আত্মা পরলোক হইতে দেখিয়া সুখী হইবে।” আর নিজের জন্য পিতার হাতে মৃত্যুই কাম্য মনে হয়েছে তার। সোমদত্তার জবানীতে উঠে এসেছে —

“এদেহ আপনি দিয়াছিলেন, আপনিই ইহার নাশ করুন।

পাষণ স্তম্ভের মতো চন্দ্রবর্মা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোমদত্তা পুনরায় কহিল, আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত

দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া পিতার কর্তব্য করুন।”

অতঃপর চন্দ্রবর্মা নিঃশঙ্কচে সর্গব ঘোষণায় সুতীক্ষ্ণ ভল্লাঘাতে সোমদত্তার দূষিত দেহকে বিনাশ করেছেন। এই দৃশ্যটিও খুবই চমৎকার— “চন্দ্রবর্মা দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ণ ভল্ল তুলিয়া লইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া কর্কশ ভয়ানক কণ্ঠে কহিলেন, সকলে শুন, আমার কন্যার দেহ অশুচি হইয়াছিল, আমি তাহা ধ্বংস করিলাম। — বলিয়া দুই পদ পিছু হটিয়া গিয়া ভল্ল উর্ধ্বে তুলিলেন। সোমদত্তা

উন্মুক্ত বক্ষে নির্ভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম।”

শরদিন্দুর গল্প বলার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। সেটা তাঁর নিজের। মূলত জাতিস্মর ধারার গল্পগুলিতে তিনি এই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন বলা যায়। story teller অর্থাৎ আখ্যান কথক কাহিনি তলের ভেতরে অবস্থান করে কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যার ফলস্বরূপ আত্মকথন রীতির আশ্রয় নেয় তাঁর গল্পের কাহিনি। এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখ্য, সোমদত্তার পরিণতির এই চিত্রটিও কথক নিজেই বলেছেন। কথক নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনায় সোমদত্তার চরিত্রবল পরিস্ফুট করবার করবার জন্য একই পটভূমিতে দু’টি চিত্র রূপ পেয়েছে। সোমদত্তা নির্ভীক, বালিষ্ঠ আর ঈশানবর্মা ভীত, কাপুরুষ। একজনের আত্মশুদ্ধ পবিত্র, কিন্তু দেহ নষ্ট অশুচি অন্যের দেহ ও আত্মা দুই-ই কলঙ্কিত পাপে জর্জরিত। এই দু’য়ের বিপ্রতিপত্তা বোঝানোর জন্য দু’টি রূপের বর্ণনা জরুরী ছিল। শেষ বাক্যটিতেও সোমদত্তার নিষ্কলুষ ও পবিত্র রূপের পরিচয় বর্ণিত। সোমদত্তার মৃতদেহের কথায় পদ্মের ‘উপমান’ -এর কথা এসেছে। রক্তচন্দন-চর্চিত শৈবালবেষ্টিত শ্বেত কমলিনীর মতো সোমদত্তার বিগতপ্রাণ দেহ মাটিতে পড়ে আছে। শৈবালবেষ্টিত রক্ত-চন্দন চর্চিত শ্বেত কমলিনী সোমদত্তা। সোমদত্তার দেহরক্ষার মধ্যে নারীর আদর্শই প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, তার ইচ্ছা মৃত্যুর বাসনাই তাকে করে তুলেছে মহনীয় ও পবিত্র।

‘মৃৎপ্রদীপ’ গল্পে প্রধান চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে সোমদত্তা। গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলি সোমদত্তার চরিত্রকে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত করবার জন্যই এসেছে। গল্পটিতে রাজা চন্দ্রগুপ্ত মুখ্য নয় — সোমদত্তা ঈশানবর্মার গল্পটাই লক্ষ্য। তাই ঈশানবর্মার তুলনায় সোমদত্তার প্রতি লেখক উদার। নারী চরিত্র অঙ্কনে শরদিন্দুর সহানুভূতি ছিল অপার। তাঁর অন্যান্য গল্পেও এই বিষয়টি চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ‘রুমাহরণ’ গল্পে রুমা এবং ‘তক্ত্ মোবারক’ গল্পে পরীবানুর কথা। সোমদত্তার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে কতগুলি দিকের আভাস পাওয়া যায়। যেমন—

ক. চক্রাযুধ ঈশানবর্মার সে কঠিন শাস্তি চেয়েছিল কিন্তু সেই শাস্তির মধ্যেও সোমদত্তার চরিত্রের বৈপরীত্যের দিকটি বর্তমান।

খ. কথকের মনে প্রশ্ন— সোমদত্তা কেন আত্মহত্যা করল না? সোমদত্তা নিজেকে রক্ষা করে কি স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও স্বামীর হততেজ পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন?

গ. ঈশানবর্মা কর্তৃক সে আশায় জল ঢেলে দেওয়ার কারণে নিজেকে কি নিষ্কলুষ প্রমাণিত করতে চেয়েছে? ঈশানবর্মার কামনা বাসনার শিকার হয়েই কি সে এই পরিণতি মেনে নিয়েছে?

উত্তরে বলতে হয় হ্যাঁ কারণ সোমদত্তা কুমারদেবীর স্মৈরিনী মনোভাব ও ঈশানবর্মার

লোলুপতা কিছুতেই মানতে পারেনি। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সে এসব কাজ করেছে। সোমদত্তা এই কাহিনির কারক। তার এই পরিণতি, তার এই বলিদান তাকে বাংলা গল্পসাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রের সামনে বলিয়েছে।

গল্পটি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। যে ভঙ্গিটি হ'ল স্মৃতিরোমছন্দ। নারীর ক্ষমতা, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়-আশয় গল্পটির উপজীব্য। সোমদত্তা দ্বন্দ্বময় চরিত্র। তবে এই দ্বন্দ্ব তার আচরণে ততটা ফুটে ওঠেনি। ঈশানবর্মার হাতে ধরা পড়ে সে তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বস্তুত গল্পটিতে একটি সাধারণ ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় যাবার মতো সংযোগ সূত্রও অনুপস্থিত। শুধুমাত্র সোমদত্তার কান্নাকে তার একটা যোজক ভেবে নিতে পারি। এই 'কান্না'র যোজক সেতু বেয়ে সোমদত্তা তার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম থেকে পরপুরুষের কাছে নিরুপায় আত্ম-সমর্পণের জীবন বেছে নিয়েছে। আসলে রোমান্স কাহিনি রচনা করতে শরদিন্দু ভোলেন নি বলেই এরকম একমুখিন সরল নির্দ্বন্দ্ব চরিত্র এঁকেছেন।

'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি কিছুটা ব্যঞ্জনাধর্মী। লেখকের বর্ণনায় সোমদত্তার রূপ লাভণ্য আর মৃৎপ্রদীপের স্বর্ণালি আলো উভয় উভয়ের পরিপূরক। মৃৎপ্রদীপকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে। মৃৎপ্রদীপ যেন একটি নারী সত্তা। একটি তুচ্ছ জরাজীর্ণ মৃৎপ্রদীপ যেমন একটি রাজ্য ধ্বংস করতে পারে তেমনি একটি নারীর ভূমিকাও যে কোনো মুহূর্তেই রুদ্রাণী ভয়ঙ্করী হতে পারে। উল্লেখ্য— "এই নোনা ধরা জীর্ণ বিশেষত্ববর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই উর্ধ্বাংশিত ক্ষুদ্র শিখার বহিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল।" অর্থাৎ মৃৎপ্রদীপটি নারী প্রকৃতির রূপক উপাদান। এই দু'টি বিসদৃশ বস্তুর জীর্ণ তাই — উভয়ের মধ্যে সাযুজ্যের কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ উভয়ের মুখের 'কালির দাগ টুকু'। প্রদীপের মুখের কালির দাগ তার দাহ জনিত সোমদত্তার চরিত্রে কালিরদাগ তার অন্যস্পষ্ট হবার কলঙ্ক।

সোমদত্তার রূপের সমানুপাতিক এই মৃৎপ্রদীপটি। এই প্রদীপটির আগুনের শিখায় যেমন মগধ রাজ্য ভস্মীভূত হয়েছিল ঠিক তেমনি চক্রাযুধ ঈশানবর্মাও সোমদত্তার রূপের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়েছিল। এখানে ধ্বংসের মুখ্য কারণ হ'ল সোমদত্তা — সোমদত্তাই এই ধ্বংসের নায়িকা। তার কথাতেও সে চিত্রই স্পষ্ট— "আমি শ্মশানের আলো।" এই কথাটি ধ্বংসের দ্যোতনা দান করে।

উল্লেখ্য, সমালোচকদের কাছ থেকে 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে জাতিস্মরণ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প বলেছেন। এখানে গুপ্তযুগের রাজ্যশাসন,

যুদ্ধ-বিগ্রহ, গুপ্তচরবৃত্তি, কাম-কেলি বিলাস সবই স্থান পেয়েছে। তদুপরি গল্পে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত একমুখিন, ঋজু ও গতিময়। মূলত আত্মকথন পরিস্থিতিতে লেখা এই গল্পটি। দীর্ঘ পরিসরযুক্ত হলেও ভাষারীতির টানে গল্পটির কাহিনি পাঠককে আকর্ষণ করে আর তাতেই গল্পটির শিল্পীত রূপ পায়। শৈল্পিকগুণ বেড়ে ওঠে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে ‘অষ্টম সর্গ’ গল্পটি ভিন্ন স্বাদের ও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সাক্ষ্য দেয়। এই গল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য— “অষ্টম সর্গ’ গল্পে যে-যুগের অবতারণা করিয়াছি সে যুগের কোনও স্পষ্ট ইতিহাস নাই। বিভিন্ন মতাবলম্বী অনুমান মাত্র আছে। যে মানুষগুলিকে এই গল্পে অবতারিত করা হইয়াছে তাঁহারা কোন শতকের লোক ছিলেন এবং একই কালে জীবিত ছিলেন কিনা, এই ক্ষুদ্র প্রশ্নের মীমাংসা করা গল্পের বিষয়ীভূত নয়। ইতিহাসের অস্পষ্টতার সুযোগ লইয়া আমি তাঁহাদের সমসাময়িকরূপে কল্পনা করিয়াছি। কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গ যে স্বয়ং কালিদাসের রচনা তাহা এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য না হইলেও মুখ্য বক্তব্য বটে।”^{১০} মুখ্য বক্তব্য কী লেখক তা বলে দিয়েছেন; মুখ্য প্রতিপাদ্য কী তা উহ্য রেখেছেন। প্রতিপাদ্য আর বক্তব্যের মধ্যে লেখক পার্থক্য করেছেন। প্রতিপাদনের অর্থ প্রমাণ করা। আর বক্তব্য যা প্রমাণ করা হচ্ছে বা হবে।

এ গল্পে ইতিহাস লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। সরস উপভোগ্য গল্প রচনার দিকেই তাঁর ঝোঁক। কিন্তু তাঁর কথায় তিনি একটি সমস্যাকে এ গল্পের কেন্দ্রে রেখেছেন।

কালিদাস গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, পৃ. ১৫৫ মল্লিনাথ কুমার সম্ভবের অষ্টম সর্গ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তার পরে করেননি। এতে দেখা যায় প্রাচীন টীকাকারেরা কুমার সম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গকে সমালোচনা করেও কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেছেন। তবে তাতেও সংশয় যায়নি। এই সশংকটুকুকে নরনারীর মনস্তত্ত্ব এবং পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে শরদিন্দু জীবন সমালোচকের দৃষ্টিতে নির্ণয় করেছেন অষ্টম সর্গ কালিদাসের রচনা কিনা। তিনি সে বিষয়ে তার ভাবনাকে কাহিনির মধ্যে যথোপযুক্ত ঘটনা সংযোজনের দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন।

‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের অষ্টম সর্গ কবি লিখেছিলেন কিনা সে প্রশ্ন বহু পুরনো। ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের কোনো কোনো গ্রন্থে ১৭ সর্গ পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু সপ্তম/অষ্টম সর্গের পরবর্তী অংশগুলি প্রশ্নিগুণ বলেই পণ্ডিতেরা মনে করেন। অষ্টম সর্গে দেব-দম্পতীর বিবাহোত্তর শৃঙ্গার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু “দেবতার সম্ভোগ শৃঙ্গার বর্ণনায় কাব্যের প্রকৃতি বিপর্যয় দোষ ঘটে।” (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড, ডি.এম. লাইব্রেরী, দ্বিতীয়

সংস্করণ ১৩৮৪, পৃ. ৬২) কাজেই দেবশৃঙ্গার বর্ণনা কবির নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সপ্তম সর্গকেই ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের উপসংহার বলেছেন ‘সপ্তম সর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিবাহ উৎসবেই কুমার সম্ভবের উপসংহার।’ (কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক, সংস্করণ ১৯৬১; ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৬২ (১৪) তবে প্রাচীন সমালোচকদের কেউ কেউ ৮ম সর্গকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেন। আনন্দবর্ধন ৮ম সর্গকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করে নিয়ে তার সমালোচনা করেছেন (জাহ্নবীকুমার, পৃ. ৬২)। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর সম্পাদিত কালিদাস গ্রন্থাবলীতে ৮ম সর্গকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন আলংকারিগণ একে “অত্যন্তমুচিৎম” বলে কটাক্ষ করেছেন। গল্পটিতে অলংকার শাস্ত্র নির্দেশিত মতের সঙ্গে কবি মনের অনুভূতিশীলতার দ্বন্দ্ব রচনা করে লেখক একটি পরীক্ষা করেছেন। কবি অলংকারশাস্ত্র নির্দেশিত নিয়ম মেনে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনের চিন্তা লাঘব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে গল্পটির উপস্থাপনা। একদিন প্রায় সন্ধ্যাকালে একটি পুরুষ নিম্নতর সোপানের এক প্রান্তে চিন্তামগ্নভাবে নীরবে বসে আছেন। “গত দুই দিন হইতে একটি দুরাহ সসম্যা কিছুতেই তিনি ভঞ্জন করিতে পারিতেছেন না।” অলংকার শাস্ত্র ঘেঁটেও উত্তর পাননি। শুষ্ক শাস্ত্রপত্রে যার উত্তর নেই মানুষের জীবন থেকেই সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি সন্ধান করছেন।

গল্পটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারটি ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলির ভিতর থেকে কবি তাঁর ঈঙ্গিত উত্তরটি পেয়েছেন। প্রথম ঘটনা শিপ্রা নদীতে কয়েকটি যুবতীর কৌতুকালাপের বর্ণনা যে আলাপের ছিন্নাংশ কবি শুনেছেন। একটি যুবতীর বর বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে— তাকে নিয়ে রসিকতা। লোলার বর ফেরেনি তার জন্য উদ্বিগ্ন। কবি এই রসিকাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন করেছেন : “তোমরা বলিতে পার কাব্যে নায়ক নায়িকার বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর কবির আর কিছু বক্তব্য থাকে কিনা?” এই প্রশ্নটিই এ কাহিনির মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান ও উত্তর প্রাপ্তি এ গল্পের বিষয়।

প্রথম ঘটনার ছিন্ন সংলাপাংশ থেকে কবি উত্তরের আভাস পেয়েছেন। যুবতীরা বিদেশাগত পতি সন্মিলনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। সেই মিলন প্রসঙ্গের ঈঙ্গিত আছে যুবতীদের পরামর্শে : “মধু মোম কুঙ্কুম আর ইঙ্গুদী- তৈল মিশাইয়া ঠোঁটে লাগাস—আর কোন ভয় থাকিবে না।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৫) বলাবাহুল্য এ মিলন ব্যাপারেরই কথা। এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর কবি যুবতীদের কাছে পাননি। কবি যুবতীদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিবাহ আর মিলন এক নয়। “আমি মিলনের কথা বলি নাই, বিবাহের কথা বলিয়াছি।” বিস্মিত

মঞ্জরিকা প্রশ্ন করেছে—“উভয়ই এক নহে কি?” কবি বলেছেন—“উহাই তো প্রশ্ন।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৬) কাজেই বিবাহ ও মিলন যেখানে এক নয় সেখানে কবির কাজ কী এ প্রশ্ন থেকেই গেছে। চতুরা অরুণিকা উত্তর দিয়েছে—“এ প্রশ্ন কখনো ভট্টিনীর নিকট করিয়াছিলেন কি?” কবি যেন একটা উত্তরের আভাস পেয়েছেন—তাই ঈষৎ চমকিত হয়েছেন। আর যুবতীদের আশীর্বাদ করে যে উক্তিটি করেছেন সেটিই ইঙ্গিতপূর্ণ—“মাতৃদেবং ক্ষণমপি চতে স্বামিনা বিপ্রয়োগঃ।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৬)

দ্বিতীয় কাহিনি লোলার। কবির মন তখনো চিন্তামুক্ত হয়নি। এই সময় শোকপরায়ণা এক বেনী ধরা যুবতী লোলাকে কবি দেখলেন। তার স্বামী রৈবতক যবদ্বীপ থেকে এখনো ফেরেনি। বিবাহিতা যুবতী স্বামীর আগমন অপেক্ষায় কাতর। কবি তাকে জানালেন রৈবতক কুশলে আছে, দু’একদিনের মধ্যেই ঘরে ফিরবে। লোলা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল “আপনি আজ অভাগিনীর প্রাণ দিলেন।” (তদেব, পৃ. ১০৭) কবি তাকে বললেন “আমার উমাকে আমি যে দুঃখ দিয়াছি তাহা স্মরণ করিলেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়; কিন্তু চরমে সে ঈঙ্গিত বর লাভ করিয়াছে। মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এবং লোলাকে আশীর্বাদ করে বললেন “তোমার জীবনেও মদন পুনরুজ্জীবিত হইবেন।” (তদেব, পৃ. ১০৮)

এই ঘটনা দুটির ভিতর দিয়ে লেখক ঈঙ্গিত উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বিবাহ ও মিলন যে এক নয়—মিলন যে বিবাহের উপরে তা দেখাচ্ছেন। এর পরের ঘটনা রাজ্যের বারমুখ্যা বারবধু প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপানকে। প্রিয়দর্শিকা মহাবিদুযী চতুঃষষ্টি কলায় পারঙ্গতা এবং অলোকসামান্যা। মহামাণ্ডলিক অবস্তীপতি এই সমাপানকে যোগ দেবেন। আর্যাবর্তের অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য তাঁকে স্মরণ করেন। প্রিয়দর্শিকার গৃহের সমাপানকের চিত্রটি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত। প্রিয়দর্শিকার একটি উক্তিতে কবির সংসার চিত্রের একটা ঝলক ধরা পড়েছে। “হায় কবি, এই সপ্তসাগরা পৃথিবী তোমার গুণে পাগল, কিন্তু তোমার গৃহিনী তোমাকে চিনিলেন না।” (তদেব, পৃ. ১১৪) প্রিয়দর্শিকার কাছেই কবি তার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। “দেব দম্পতির বিবাহোত্তর জীবন চিত্রিত করা কি কাব্য কলা সঙ্গত হইবে?” (তদেব, পৃ. ১১৫) প্রিয়দর্শিকা অলংকারশাস্ত্র এবং নীতি শাস্ত্র সংগত নিষেধাত্মক উত্তর দিয়েও বলেছেন : “কাব্যশাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। সত্যের অনুজ্ঞায় সকলেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাতে বাধা নাই।” (তদেব, পৃ. ১১৫) কবি আবার বলেছেন তিনি নিজের অন্তরের কথা বুঝতে পারছেন না, তাই তাঁর সংশয় দূর হচ্ছে না। প্রিয়দর্শিকা উত্তর দিয়েছেন “আজ আপনি গৃহে প্রত্যাভর্তন করুন—রাত্রি গভীর হইয়াছে। কাল প্রাতে যদি আপনার মনে কোনও সংশয় থাকে, আমার অভিমত জানাইব।” (তদেব, পৃ. ১১৫)

গল্পে এই তিনটি ধাপ পেরিয়ে কবি বাড়ি ফিরে এসেছেন। বাড়িতে স্ত্রীর মুখোমুখি হয়েই তাঁর কটু তিরস্কারের মুখে পড়েছেন। কবির মুখের উপর শয়ণকঙ্কের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন। আর কবি অন্ধকারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন “এই তাঁহার গৃহ। এই তাঁহার ভার্যা। গৃহিনী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা।” (তদেব, পৃ. ১১৬) কবি যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কাব্য রচনা করেন সেই প্রকোষ্ঠে গিয়ে দীপ জ্বলে মৃগচর্ম বিছিয়ে বসেছেন। কুমারসম্ভবের পুথির উপর চোখ পড়েছে আর বিদ্যুৎচমকের আকস্মিক প্রভা তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে খেলে গেছে। প্রিয়দর্শিকা ঠিক বুঝেছিলেন। কবির আর কোনো সংশয় নেই। কবি মসীপাত্র লেখনী ও তালপত্র নিয়ে লিখতে বসেছেন অষ্টমসর্গ। কবির শরের লেখনী তালপাতার উপর দিয়ে শব্দ করে এগিয়ে চলেছে—‘পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্ —’

অষ্টমসর্গ গল্পটি কুমারসম্ভবকাব্যের উপসংহার বিষয়ক প্রশ্নের কবি জনোচিত সমাধান মাত্র নয়; এটি আধুনিক মানুষের কিংবা চিরকালীন মানুষের জীবন সমস্যারও একটি উন্মোচন। নরনারীর বিবাহ মাত্রই যে চিন্তের মিলন সাধন নয়—তা বলা যায় না। কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গের বর্ণনা উপযুক্ত হবে কিনা কবি কালিদাসের মুখে সে প্রশ্ন তুলে গল্পকার একটি চিরকালীন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার একটি সমাধানে পৌঁছেছেন। এ গল্পে সে যুগের মানুষের জীবনকথার ছোট্ট একটু পর্দা উত্তোলন করে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন। বিদেশগত স্বামীদের জন্য যুবতী নারীদের উদ্বেগ চিন্তা মিলনোৎকর্ষা, নারীদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে তাদের জীবন কথার ছিন্নাংশ; বারমুখ্যা প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপনের চিত্রে সেকালের উচ্চ অভিজাত জীবনের টুকরো টুকরো খবর লেখক উপস্থাপিত করেছেন। গল্পে বর্ণিত মানুষের জীবনের এই টুকরো টুকরো চিত্রে লেখক সেকালের ইতিহাসের ঘটনাকে একটুখানি আলোকিত করে তুলেছেন।

ড. সুকুমার সেন—“শরদিন্দুবাবু গল্পটির মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন যে কালিদাস সাত সর্গ পর্যন্ত লিখে থেমে গিয়েছিলেন। কারণ আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রমতে বিবাহ ঘটনার পরবর্তী দাম্পত্য সহবাস কাব্যে অথবা নাট্যে বর্ণনীয় বিষয় নয়। কাব্যনামটির কথা স্মরণ করে কবির মন বাসর ঘরের চৌকাট অবধি এসে থেমে যাওয়ায় মন সরছিল না। যেভাবে তাঁর কবি দৃষ্টি দেব-দম্পতীর দ্বার প্রান্ত থেকে উঁকি দেবার ঔৎসুক্য পেয়েছিল তাই রচনাটির গল্প সত্ত্ব।”^{১১} অলঙ্কার শাস্ত্রের যে বিধিই থাকুক না কেন কবির মনের স্বাধীনতাও বর্তমান। আলোচ্য গল্পটিতে শরদিন্দুবাবু তারই পরিচয় দিয়েছেন।

উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদী, ময়ূরিকা, মঞ্জরিকা, প্রিয়দর্শিকা, কালিদাস, বরাহমিহির, অমর সিংহ,

বেতাল ভট্ট প্রভৃতি স্থাননাম ও ব্যক্তিনামে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথাই স্মরণ করিয়েছেন। তবে এগল্লে ইতিহাস কিছু নেই। মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হিশেবে উঠে এসেছে সেযুগের সমাজ ও মানুষের জীবন-যাত্রার প্রণালী।

আলঙ্কারিক বিতর্কের আড়ালে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন দাম্পত্য সম্পর্কের সংশয়, সন্দেহ বিশ্বাসহীনতা, দোলাচলতা, আশাহীনতা সর্বোপরি মানসিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অশান্তির শাস্বত প্রতিচ্ছবি। আলোচ্য ‘অষ্টম সর্গ’ গল্লে কবি কালিদাস ও কবি পত্নীর দাম্পত্য-প্রেম-অপ্রেমের বর্ণনায় শরদিন্দুবাবু সেকালের দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সরস ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন। আবার সেকালের নারীদের বর্ণনায় লেখক দেখিয়েছেন সকলেই শিপ্রাতীরে দেখা যুবতীদের মতো সুভাষিণী বা চতুরিকা নন। প্রিয়দর্শিকার মতো বিদুষী ও রসকলাবিৎ নন। কবি পত্নীর চিত্রে লেখক তা দেখিয়েছেন। কবির প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপানকে যাওয়া নিয়ে কবি পত্নীর মনের মধ্যে যে ঘৃণা জাগরুক হয়েছে তাতে নারী চরিত্রের আর একটি দিকও তুলে ধরা গেছে। মোটকথা সেকালের জীবন যাত্রার কিছু প্রাণবন্ত চিত্র এই গল্লে ফুটিয়ে তুলে লেখক ইতিহাসের প্রাস্তবর্তী অংশ একটু হলেও আলোকিত করেছেন। বলাবাহুল্য এর সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের কোনো মিল আছে কিনা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভাব্য ইতিহাসের যে গঠন কবির গল্লে হয়েছে তাকে একেবারে অমূলক বলা সম্ভব নয়।

গল্লেখকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মরু ও সঙঘ’ গল্লেখটি ‘বিষকন্যা’ গল্লেখগ্লে স্থান পেয়েছে। এই গল্লেখটিতে উঠে এসেছে মানুষের প্রবৃত্তির কথা। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে শরদিন্দুবাবুর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় বহু গল্লেখ উপন্যাসে পাওয়া যায়। ‘মরু ও সঙঘ’ গল্লেখটিতেও বৌদ্ধধর্মের নিয়ম-নীতি, কৃচ্ছ সাধন পদ্ধতি ও নিষ্ঠার কথা বর্ণিত হয়েছে।

মধ্য এশিয়া বা চীনেয় তুর্কিস্থান গল্লেখটির পটভূমি। বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও পরিণতি এবং এই অঞ্চলের ঘটে যাওয়া ঘটনা মরুগ্রাস গল্লেখটির উপজীব্য বিষয়। উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধর্মের কঠোরতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, রীতি-নীতি, দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি সঙঘ-স্থবির পিথুমিত্ত এবং বৌদ্ধ শ্রমণ উচণ্ডের মধ্যে দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলেও শেষ পর্যন্ত মানব ধর্মের জয় হয়েছে। নির্বাণ ও ইতি তার প্রমাণ। নির্বাণ ও ইতির প্রেম-ভালোবাসা ধর্মের কঠিন আগল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। প্রতাপের চেয়ে, ধর্মের চেয়ে প্রেম ও যে বড় সেই সত্যই একে প্রকাশিত। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাণ ও ইতি ধর্মের অনুশাসনে শৃঙ্খলিত থাকে নি।

মোট চারটি চরিত্র গল্লেখটিতে। প্রত্যেকই বৌদ্ধসঙঘের অধিবাসী। তারা হলেন বৌদ্ধসঙঘের অধ্যক্ষ স্থবির পিথুমিত্ত, ভিক্ষু উচণ্ড, নির্বাণ ও ইতি। মূলত পিথুমিত্ত ও উচণ্ডের বিপ্রতীপে নির্বাণ

ও ইতি স্থাপিত। নির্বাণ ও ইতি এক আঁধির সময় নিতান্ত বাল্যকালে এই সংঘে এসে পড়ে। তখন তাদের বয়স আনুমানিক যথাক্রমে পাঁচ-ছয় বছর ও দেড় বছর। সংঘ স্থবির এই দু'জনকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছিলেন।

গল্পে বর্ণিত নির্বাণ ও ইতি এই দুই যুবক যুবতীকে বাল্যকালে কুড়িয়ে পেয়েছিল বৌদ্ধভিক্ষু পিথুমিত্ত ও উচণ্ড। সঙঘারামে স্থান দেওয়ার পর উভয়ের বাল্য-কৈশোর নির্দিধায় কেটে গিয়েছিল কিন্তু যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পর নিষিদ্ধ সম্পর্ক অনুভব করায় তাদের চিন্তায় সরলতা হারিয়ে যায়। নির্বাণ ইতিকে দেখে সঙ্কুচিত হয় তাকে এড়িয়ে চলতে চায় অথচ ভিতরে ভিতরে আকর্ষণ অনুভব করে। ইতির চিন্তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নারীত্বের পূর্ণতা অনুভব করে নিজের নারীত্বের নিষ্ক্রেমে সে নির্বাণকে আপন করে নিয়েছে। সঙঘারামের দ্বিতীয় ভিক্ষু উচণ্ডের কাছে তাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার ব্যাপারটি চোখে পড়তে লাগল। উচণ্ড সঙঘারামের নিয়ম-নীতির কঠোর বাঁধনে বাঁধতে চাইলো নির্বাণকে। ইতির দেহে যৌবন লক্ষণ দেখে উচণ্ডের বিমুখতা গভীর আক্রোশে পরিণত হল। “ভিক্ষুর নিপীড়িত ব্যর্থ যৌবন যেন ইতির মূর্তি ধরিয়া নিরন্তর তাহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল।” তার মনে হ'ল সংঘে ‘যার’ প্রবেশ করেছে। উচণ্ড ছিল নির্বাণের শিক্ষক, সেই থের পিথুমিত্তকে বলে নির্বাণকে দীক্ষা দেওয়া যায়। নারীর আকর্ষণ ও আসক্তি থেকে দূরে রাখবার জন্য নির্বাণকে ‘উপসম্পদা’ দান করে সঙঘারামের ভিক্ষু হিশেবে গ্রহণ করা হয়। সেখানে কামনা-বাসনা-লোভের স্থান নেই। সেখানে একমাত্র মূলমন্ত্র হ'ল— ‘সঙঘং শরণং গচ্ছামি।’ বৌদ্ধধর্মের তাই-ই নীতি। নির্বাণ ইতির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে নিজের প্রাণধর্মের বাইরে গিয়ে স্বেচ্ছায় এই কঠিন জীবন স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু মন থেকে তা সে মেনে নিতে পারে নি। স্থবির তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি নির্বাণকে বুঝিয়েছেন “যার অন্তরে বৈরাগ্য এবং নির্বাণ তৃষণ জন্মিয়াছে সেই সংঘের অধিকারী” কিন্তু ব্যাধতাড়িত হরিণের মতো উচণ্ডের শাসন এবং তিরস্কার ক্লিষ্ট নির্বাণ কর্তব্য স্থির করতে না পেরে একটা কাজ স্বীকার করে নিয়েছে। একদিকে উচণ্ডের তিরস্কার ভীতি অন্যদিকে ইতির প্রেমের আকর্ষণ—দুই থেকে মুক্ত হবার এছাড়া অন্য কোনো পথ তার ছিল না। নির্বাণ দীক্ষা নিয়ে চিন্ত স্থির করতে চেয়েছে— পারেনি। ইতির টান তার প্রাণধর্মের আকর্ষণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা সেই আকর্ষণের হাত থেকে মুক্তির চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ভগবান তথাগতের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়েছে। ইতির আকর্ষণে নির্বাণ ধরা দিয়েছে এবং উচণ্ডের দেওয়া দণ্ড স্বীকার করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এই দণ্ডদেশের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা সকলেই বোঝে। এ তাদের ‘মৃত্যুদণ্ড’। সেই মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করে সংঘ থেকে তারা বেরিয়ে গেছে। একদিন পাতিমোক্ষ পাঠ শেষ করে স্থবির মাননীয় ভিক্ষু উচণ্ডকে প্রশ্ন করেছিলেন

“যদি কোনো পাপ করিয়া থাকেন খ্যাপন করুন।” (শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০২) উচণ্ড নীরব থেকেছেন। কিন্তু তারই অন্তরের ঈর্ষা ও পাপদ দুটি জীবনকে মৃত্যু পথে ঠেলে দিয়েছে।

এই শান্তি মহাস্থবির মেনে নিতে পারেননি তিনি নির্বাক থেকেছেন। তিনি বলেছেন “মহাভিক্ষুর অভিপ্রায় দুর্জয়। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। কতব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।” উচণ্ড নিজের কঠোরতায় বৌদ্ধ বিধানকে যথাযথভাবে পালন করবার গৌরববোধ করেছে। কিন্তু স্থবিরের কথায় সেও বুদ্ধের ইচ্ছা বুঝতে চেয়েছে। এবং আরেক আঁধির দিকে নির্বাণ ও ইতিকে ফিরিয়ে আনতে বেরিয়েছে। ‘মরু ও সংঘ’ গল্পটিতে একদিনে সংঘ মানবজীবনের আশ্রয়রূপে আর মরু ধ্বংসরূপে চিত্রিত হয়েছে। আশ্রয় আর ধ্বংস বাইরের প্রকৃতির এই লীলার ভিতরে ভিতরে আরও এবং আশ্রয় নিরাশ্রয়ের দ্বন্দ্ব চলেছে। সেখানে ইতি আশ্রয় উচণ্ড ধ্বংস নির্বাণ এ দুয়ের টানাপোড়নে আক্রান্ত। বাইরে মরুঝড় এসে সংঘকে ধ্বংস করছে আর ভিতরে জীবনধর্মের বিরুদ্ধে চলেছে শুষ্ক শাস্ত্র পত্রের অনুশাসনে জীবনকে নিরুদ্ধ করবার প্রক্রিয়া। লেখক দেখিয়েছেন ধর্মের শুষ্কতার বিরুদ্ধে এই কিশোর কিশোরী জীবনধর্মকেই জয়যুক্ত করবার জন্য প্রাণবাতি ধরে মরু পথে যাত্রা করেছে। সে যাত্রা মৃত্যু পথগামী কিন্তু তবু গল্পকার সেই জীবনের আকাঙ্ক্ষাকেই জয়যুক্ত করেছেন।

গল্পের শেষে উচণ্ডের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। আকাশের আঁধিতে তিনি বুদ্ধের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখেছেন।

“উচণ্ড চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি যাইব। তাহাদের ফিরাইয়া আনিব — তাহাদের ফিরাইয়া আনিব।” মানব জীবন ও মানবিক গুণাবলীর চরমোৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে স্থবির পিথুমিন্তের মধ্যে দিয়ে। তিনি অন্তরে বাইরে একান্তভাবে সৎ থাকতে চেয়েছেন। তিনি প্রকৃত তথাগতের অনুরক্ত। আত্মবিকারের দ্বারা সত্যকে তিনি আবৃত করেননি। প্রকৃত ধর্মের কথা বলেছেন। ধর্মে দীক্ষিত হয়েও উচণ্ড প্রকৃত ধার্মিক নয়; কারণ ধর্মের পরিপন্থী বিষয়-আশয়ে ঈর্ষা ও লোভ প্রভৃতি ত্যাগ করতে পারেনি সে। পিথুমিন্তের মধ্যে দিয়ে লেখকের মূল বক্তব্য প্রকাশ পায়। এছাড়াও বৌদ্ধধর্মের আদর্শের কথাও ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কথায়। নির্বাণ চরিত্রটির নামকরণেই তা বোঝা যায়। ইতি নামের তাৎপর্যে প্রেম, ভালোবাসা, সুকুমার প্রবৃত্তি ও অহিংসার কথাই প্রকাশ পায়। এই সকল রিপূর হাত থেকে পরিত্রাণা পাওয়ার নামই তো নির্বাণ বা মোক্ষ। লেখক এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে মানবজীবনের পবিত্র প্রেম, স্বচ্ছন্দ জীবন ও অনাবিল আনন্দের কথাই বলতে চেয়েছেন ‘মরু ও সংঘ’ গল্পটিতে। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ‘সাহিত্য বিতান’ গ্রন্থে ‘বর্তমান বাংলা সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে ‘মরু ও সংঘ’ গল্পটির এই সত্যের কথাই বলেছেন—

“... অতীতের রোমান্সকে তিনি (‘মরু ও সঙ্ঘ’) গল্পে যে রূপ-রস দান করিয়াছেন, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। এ গল্পের কল্পনা ও পরিকল্পনায় তিনি যে ভাবুকতা ও দার্শনিক রস দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মানব-জীবনের শাস্ত্রত সমস্যাই তাঁহার জীবন-দর্শনকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি তাহাতে যে একটি সুকণ্ঠিত সুমার্জিত বিদ্বান-সুলভ মনোভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও অনন্য সুলভ। এই কাহিনীতে রোমান্স-রস বা ইতিহাসের যাদু যেমন চরমে উঠিয়াছে, তেমনই ইহার ভাববস্তু হইয়াছে — মানুষের সহিত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব, ভিতরে ও বাহিরে সেই এক শত্রুর সহিত প্রাণাস্তিক সংগ্রাম এবং পরিণামে সেই চিরন্তন হাহাকার।”^{১২}

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসাহিত্যের ভাঙারে ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটি ‘বিষকন্যা’র মতো বড় গল্পগুলির অন্যতম। গল্পটির কাহিনি দু’টি আবর্তে দশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। শরদিন্দুবাবুর অসাধারণ গল্প বলার ভঙ্গি ও ভাষার পরিবেশানুগ ও চরিত্রানুগ ব্যবহার গল্পে কাহিনিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য— “শঙ্খ-কঙ্কণের narrative চমৎকার। এমন মধুর প্রাঞ্জল narrative শক্তি বর্তমানে আর কোনো লেখকের নাই — কাহারোর নাই — এই কাহারো মধ্যে জীবিত সমস্ত লেখকই পড়েন। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে তুলনীয় ‘প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তবে তিনি ইতিহাসে পদক্ষেপ করেন নাই। ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে আপনার জুড়ি নাই।”^{১৩}

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’-এ লেখক ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। তুর্কো-মুসলিম শাসক আলাউদ্দিন খিলজীর দিগ্বিজয় যাত্রা ও তার মনোজগতের স্বরূপটি কথাকার গল্পে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আলাউদ্দিনকে কেন্দ্র করেই গল্পে দিল্লীর সুলতানী যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়। লেখক সুলতানী রাজত্বের দমন-পীড়ন নীতির পাশাপাশি ছোটছোট হিন্দু রাজ্য ও সেই রাজ্যের রাজাদের রাজধর্ম-কুলধর্ম-রাজ্য শাসন পদ্ধতি, অন্দরমহলের রীতি-নীতি, পারস্পরিক সংহতি ও মৈত্রীর বিষয়টি ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

ইতিহাসে পাঠে জানা যায় যে, খ্রিস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে শিশুনাগবংশীয় রাজাদের মধ্যে পিতৃপুরুষকে হত্যা করে সিংহাসন হাসিল করবার রেওয়াজ ছিল। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটিতেও সেই ছবিই ধরা পড়ে। গল্পটি মূলত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পটভূমিকায় রচিত। আলাউদ্দিন খিলজীও সেই কৌশলই অবলম্বন করে সিংহাসনে দখল করেছে। সর্বোপরি পিতৃব্যের ছিন্ন মস্তক বর্শাফলকের শীর্ষদেশে গেঁথে দিল্লীর রাজপথ পরিক্রমা করেছে। গল্পকারের ভাষায় — “তাঁহার রণপাণ্ডিত্য ছিল, আর ছিল অনির্বাণ নারী তৃষ্ণা। এই দুই মিলিয়া তাঁহার চরিত্র পিশাচতুল্য করিয়া

তুলিয়াছিল। ভারতের অন্ধকার মধ্যযুগেও তাঁহার সমান বিশ্বাসঘাতক নৃশংস ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুলতান বোধ হয় বেশি ছিল না।” এটাই হ’ল ক্ষমতা ও দম্ভ প্রকাশের সেকালীন রীতি রেওয়াজ।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটি বিশ্লেষণের পূর্বে কাহিনির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। স্বেচ্ছাচারিতায় তুর্কো-মুসলিম শাসকের আলাউদ্দিনের দেশীয় রাজা ভূপসিংহের ভাগ্য বিপর্যয় ও বিড়ম্বনার কাহিনি এতে স্থান পেয়েছে। আলাউদ্দিন ভূপসিংহকে কেন্দ্র করে তৃতীয় ব্যক্তি ময়ূরের শৌর্য ও বীর্যের প্রকাশ। ভট্টনাগেরশ্বরের মুখে কাহিনি বর্ণিত। জানা যায়, ভূপসিংহ রানী, রাজকুমারি, দাস-দাসী ও পাবদত্ত প্রজাদের নিয়ে পরম শান্তিতে রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় আলাউদ্দিনের নজর পরে তাঁর রাজ্যের ওপর। ভূপসিংহের সুন্দরী কন্যা শীলাবতীকে ‘সওগত’ হিসেবে চেয়ে বার্তা পাঠায় আলাউদ্দিন খিলজী। আলাউদ্দিনের হাত থেকে বাঁচবার উপায় নেই যেনে ভূপসিংহ নিজের কন্যাকে না পাঠিয়ে দাসী সীমাস্তিনীকে পাঠান। কিন্তু আলাউদ্দিন এই ছল বুঝতে পেরে সাতদিন ভোগ করে রাজপুরী তল্লাশী করে শীলাবতীকে হরণ করে নিয়ে যায়। গল্পে বর্ণিত ভূপসিংহের রাজমহিষী সোমশঙ্কাকে আঁতুরঘরে রেখে মারা যান। এইসব যত্নগায় ভূপসিংহের মনে প্রতিশোধ বাসনা জেগে ওঠে। প্রথমত ছেলে রামরুদ্রকে দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রামরুদ্র মারা যায়। নিঃসহায় হয়ে পড়ে ভূপসিংহ। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। সুযোগ বুঝে আলাউদ্দিনকে যোগ্য জবাব দেবেন। এদিকে ভূপসিংহের নির্দেশে ভট্টনাগেশ্বর সপ্তমপুরে ‘গোপনীয় দূতকার্যে’ গেছেন। ফেরার সময় একভাগ্যাস্থেয়ী যুবকের দেখা পেয়ে ভূপসিংহের ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনি শোনান। যুবকটির নাম ময়ূর। সে দক্ষ তীরন্দাজী। ভট্টনাগেশ্বর তা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলে মহারাজের নিকটে চলো মহারাজ তোমায় অনুগ্রহ করবেন। যথারীতি ময়ূর রাজপ্রাসাদে চলে আসে। মহারাজ প্রসন্ন হন এবং ভাবেন সবই ভাগ্যের ফল। তাই উপযুক্ত জবাব দেবার সময় এসেছে। ময়ূরকে রাজপ্রাসাদে স্থান দেন। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা ভূপসিংহ ময়ূরকে অনিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। সুযোগ বুঝে ভূপসিংহ আলাউদ্দিনের ব্যভিচারের ফল সামস্তিনীর কন্যা চঞ্চরীকে ময়ূরের সঙ্গে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দিল্লীতে পাঠান। আলাউদ্দিন নিজের কন্যাকে ভোগ করুক এটা ভূপসিংহ দেখতে চান। কানুক আলাউদ্দিন বুকুক—সে কতটা নীচ। বলা যায়, ভূপসিংহ চঞ্চরীকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে মোক্ষম জবাব দিয়েছেন।—এটাই হবে আলাউদ্দিনের প্রতি তাঁর চরম প্রতিশোধ। বাস্তবে তাই-ই ঘটেছে। চঞ্চরীর সর্বস্ব হরণ করার পর আলাউদ্দিন জানতে পারে সে তারই কুকীর্তির ফসল। চঞ্চরী তারই ঔরসজাত। এই ঘটনায় আলাউদ্দিন উন্মাদ বিকৃত মস্তিষ্ক ও রুগ্ন হয়ে পড়ে। তিন বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ময়ূরও শীলাবতীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। শেষে ময়ূর ভূপসিংহের

ছোট কন্যা সোমশুক্রাকে পরিণয়সূত্রে বাঁধতে চেয়ে ভূপসিংহের অনুমতে প্রার্থনা করে। এইভাবে মিলনের মধ্যে দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

এবারে ব্যাখ্যা ও বিচারে-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে গল্পটির মর্মসত্য উদ্ধার করা যাক।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ বড় গল্প। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির অধিকাংশই আকারে বড়। কাহিনি রচনার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। কাহিনি বর্ণনার গুণে ঘটনার চমৎকারিত্ব রচনায় তিনি পাঠকের চিত্ত জয় করেছেন। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান বা চরিত্র রচনার অনাবিস্কৃত দৃষ্টিকোণ তিনি তেমন ব্যবহার করেননি। ঘটনার পর ঘটনা রচনায় সম্ভব অসম্ভবের মিলন সাধনে, কাহিনির চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে তাঁর পারঙ্গমতা অতুলনীয়। তাঁর বিষকন্যা, মৃৎপ্রদীপ, চুয়াচন্দন সবই আকারে বড় গল্প। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ দুই আবর্তে দশ পরিচ্ছেদে সাজানো সেই বড় গল্পের একটি।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পের বিষয় একটি প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থতা। কিন্তু প্রতিশোধের জন্য আক্রোশ ক্রোধ বা অন্তর্যন্ত্রণার দাহ গল্পে নেই। বরং একটা পরাজিত মানসিকতা এবং অক্ষমের নিলিপি আছে। তাছাড়া প্রতিশোধের জন্য নিরন্তর ষড়যন্ত্র কিংবা উদ্যম এ গল্পে দেখা যায় না। শরদিন্দু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রোমান্সধর্মী কাহিনি রচনায় লঘু এবং ধীর সঞ্চারি পদক্ষেপে গল্প বলে চলেছেন। এ গল্পে ইতিহাস নিতান্ত পটভূমি মাত্র—আলাউদ্দিন নামমাত্র চরিত্র। আলাউদ্দিন সম্বন্ধে ইতিহাসের একটি সিদ্ধান্ত তিনি প্রস্তাবনা অংশে বলে দিয়েছেন। তিনি ‘রণপাণ্ডিত’ ছিলেন। আর একটি সিদ্ধান্তও ইতিহাস সমর্থিত—তাঁর অনির্বাণ নারী তৃষণ ছিল। তিনি গুজরাতের রানী কমলাকে নিজের অঙ্কশায়িনী করেছিলেন—একথা ঠিক। ‘পদ্মিনী’ সম্বন্ধে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের কিছু সন্দেহ থাকলেও তাও মোটের উপর তাঁর একটি নারীতৃষণ গল্প। এই ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পটি আলাউদ্দিনের নারীতৃষণ উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা। এবং এক অর্থে poetic justice ব্যবহার করে গল্পে এই নারীতৃষণকেই আলাউদ্দিনের পতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা। আলাউদ্দিনের রণপাণ্ডিত্যের দিক এই গল্পে দেখানো হয়নি, তাঁর বহু যুদ্ধে জয়লাভ, বহিরাগত মোগলদের বহুবার প্রতিহত করা, প্রশাসনিক ভূমিকা—এ গল্পে নেই। থাকার প্রয়োজনও নেই। লেখক তাঁর চরিত্রের একটি মাত্র দিককেই প্রতিফলিত করেছেন।

আলাউদ্দিন এ গল্পের ইতিহাসের চরিত্র, গল্পের প্রধান চরিত্র নয়। আলাউদ্দিনের নারীতৃষণ অন্য যে মানুষের জীবনে বিপর্যয় এনেছে—যে মানুষের সংসারকে তছনছ করে দিয়েছে— সেই ভূপসিংহের প্রতিহিংসা নেওয়াকে কেন্দ্র করে এ গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভূপসিংহও এ গল্পের মূল চরিত্র নয়। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা, প্রতিশোধ নেওয়া—এটা ভূপসিংহের লক্ষ্য। কিন্তু সেটাই গল্পের প্রথম থেকে দেখানো হচ্ছে না। ভূপসিংহ এসেছে অনেক পরে। প্রথম আবর্তের

দ্বিতীয় অংশে তিনি তাঁর বয়স্যের গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হন, তৃতীয় অংশে আমরা তাঁকে প্রথম দেখি। দ্বিতীয় অংশে রাজ বয়স্যের মুখে ভূপসিংহের বিপর্যয় কাহিনি এবং এর পিছনে আলাউদ্দিনের ভূমিকা জানানো হয়েছে। এই পরোক্ষ উপস্থাপনায় বোঝা যায় ভূপসিংহও গল্পের মূল লক্ষ্য নয়। তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে তাঁর কোনো নিজস্ব ক্রিয়া নেই, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং বেদনাহত চরিত্র (passive sufferer) মাত্র। নিষ্ক্রিয় বেদনাহত ভূপসিংহ একবার প্রত্যক্ষভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিফল হয়েছেন; সেটাও গল্পের অতীত ক্রিয়া। দ্বিতীয়বার কী কৌশলে তিনি তার প্রতিশোধ স্পৃহা সফল করলেন তা বর্তমানের কাহিনি। এবং এই কাজে তাকে সফলতা এনে দিয়েছে যে মানুষটি— সে ময়ূর। আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়েই কাহিনি গড়া হয়েছে—এ গল্পের কেন্দ্রে তাকেই রেখেছেন গল্পকার।

প্রস্তাবনা অংশে আলাউদ্দিনের পরিচয় দেবার পর লেখক পরের অংশ থেকে কাহিনি বর্ণনা শুরু করেছেন। “দিল্লী হইতে দুই শত ক্রোশ দক্ষিণে বিক্ষ্যগিরির ক্রোড়ে সাতপুরা শৈলমালার জটিল আবর্তের মধ্যে এই কাহিনীর সূত্রপাত।” সাতপুরা শৈলমালার আবর্তের মধ্যে সাতটি ছোট ছোট রাজ্যের কথা দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে। সেই রাজ্যগুলি বর্তমানে লুপ্ত কিন্তু আলাউদ্দিনের সময় সেগুলি ‘জীবিত’ ছিল। এই গিরিসংকটের মধ্যে ভাদ্রমাসের দ্বিপ্রহরে এক ‘পথভ্রান্ত পথিক’কে নিয়ে এ কাহিনি আরম্ভ হয়েছে। পথিকের ইতিবৃত্ত লেখক পরে বলবেন, আগে তার পরিচয় দিয়েছেন—

“পথিকের বয়স অনুমান বাইশ- তেইশ বছর। সুঠাম বেত্রবৎ দেহ, দেহের বর্ণও বেত্রবৎ। মুখের গঠন খড়্গের ন্যায় শাণিত, কিন্তু মুখের ভাব শান্ত ও সহিষ্ণু। চোখের দৃষ্টি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সুদূর প্রসারী, কিন্তু তাহাতে শ্যেনপক্ষীর হিংস্রতা নাই। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে; ঠোঁটের উপর অল্প গোঁফ। পরিধানে একখণ্ড বস্ত্র কটি হইতে জুঙঘা পর্যন্ত আবৃত্ত করিয়াছে, দ্বিতীয় একখণ্ড বস্ত্র উত্তরীর আকারে স্কন্ধের উপর ন্যস্ত। হাতে ধনু এবং তিনটি বাণ।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭)

এ বর্ণনায় যে মানুষটিকে দেখান হল তার বয়স, গাত্রবর্ণ, মনের ভাব এবং তার দেহের ও মনের শক্তির পরিচয় আছে। তার সঙ্গে বেশবাস ও কেশ বিন্যাসের কথায় সে মানুষটির সময় বোঝানো হয়েছে। হাতের অস্ত্র তার যোদ্ধত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত। শরদিন্দু এই চরিত্রটিকেই কাহিনির কেন্দ্র রেখে গল্প সাজিয়েছেন। যদিও আলাউদ্দিনের কথা দিয়ে গল্পের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তবু কাহিনিতে আলাউদ্দিনের বর্তমান ক্রিয়ার কোনো কথা বলা হয়নি। আলাউদ্দিনের কাজের পরিণাম রাজ্যগুলির মধ্যে কী বিশেষ করে পঞ্চম পুরে হয়েছে এবং পঞ্চমপুর কী অবস্থায় আছে সে কথা

বলতেই কাহিনিতে আলাউদ্দিনের কথা এসেছে। আমাদের এই চরিত্রটিকে নিঃসঙ্গ না রেখে লেখক এই অংশে দ্বিতীয় একটি চরিত্রকে এনেছেন। এখান থেকে পরিচয় পর্ব সরিয়ে রেখে গল্পের শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় মানুষটি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। মানুষটি শীর্ণকায় বেশভূষা ভদ্র, পায়ে পাদুকা, মাথায় উষণীষ, ভাবভঙ্গী ও বাচনশৈলী হাস্যরস মিশ্রিত। মানুষটি ভট্ট নাগেশ্বর, পঞ্চমপুরের রাজা ভূপসিংহের বয়স্য। হঠাৎ দ্বিপ্রহরে তাঁর মতো লোকের এই পথে বেরোনোর একটা কৈফিয়ৎ আছে তিনি “গোপনীয় দূতকার্যে” সপ্তমপুরে গিয়েছিলেন। গল্পের পরের বেশ কিছু অংশ কেবল ভট্টনাগেশ্বর এবং প্রথমোক্ত যুবকের ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভট্টনাগেশ্বরের ক্ষুধা কাতরতা, যুবকের তীর নিক্ষেপ করার দক্ষতা একই সূত্রে গাঁথা। তীরক্ষেপণের দক্ষতার জন্যই ভট্টনাগেশ্বর তাকে পঞ্চম পুরের মহারাজার কাছে নিয়ে গেছে “তুমি যে রকম অব্যর্থ তীরন্দাজ, মহারাজ নিশ্চয় তোমাকে অনুগ্রহ করবেন।” যাবার পথে যুবক ময়ূরের সঙ্গে কথায় কথায় নাগেশ্বর ভট্ট এই রাজ্যগুলিতে আলাউদ্দিনের অভিযান এবং পঞ্চমপুরের রাজা ভূপসিংহের ভাগ্য বিড়ম্বনার কাহিনি শুনিয়েছেন। শরদিন্দু পাঠককে গল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং অতীতের ঘটনা জানাতে এই কৌশল নিয়েছেন।

ভূপ সিংহের পরিবারের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দিকে আলাউদ্দিন খিলজীর নির্দেশে ভূপ সিংহের কন্যা শীলাবতীকে লুণ্ঠন ও হরণ করা, দ্বিতীয় সদ্যোজাত কন্যা সোমশুল্লাকে আঁতর ঘরে রেখে স্ত্রীর মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা ভূপ সিংহকে পয়দস্ত করে তুলে। তাছাড়াও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একমাত্র পুত্র রামরুদ্রের মৃত্যু তাঁকে আরো নিঃসহায় করে তোলে। শাস্ত স্বভাবের এই মানুষটির অন্তরে প্রতিশোধ বাসনার আগুন জ্বলতে থাকে। কীভাবে সে আলাউদ্দিনের প্রতিশোধ নেবে সেই চিন্তায় সেদিন কাটাচ্ছে। আবার তার মনে হয়েছে প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ গ্রহণ প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। কিন্তু প্রতিশোধের নেশা তাঁর মন থেকে সরছে না। এই দোলাচলতায় সে উদ্ভিন্ন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমান আমলের নৈরাজ্য অস্থিরতা মুসলিমদের ক্ষমতা বিস্তার ও হিন্দু-মুসলিমের যুদ্ধ, ঘটনাকে গল্পটিতে দেখাতে চেয়েছেন। দিল্লীর সুলতানী যুগের কদর্য-পক্ষিলতা, আবিলতা ও প্রতিহিংসা ইত্যাদি ভ্রষ্টাচারের ছবিও এতে পাওয়া যায়। দাসী রমণীদের সম্বন্ধেও শরদিন্দুর ভাবনা-চিন্তার কথা জানা যায়। সেকালে নারীরা শুধুই দাসী, শুধুই ভোগ্যপণ্য, ক্ষমতাবান পুরুষদের অধিগত, নারীর কোনো স্বাধীন ভাবনা-চেতনা বাক-স্বাধীনতা এসব কিছুই ছিল না। বলা যায়, জোর যার মুলুক তার।

শরদিন্দুর গল্প বলার কৌশলে দুটি বিষয় উঠে আসে পাঠেও তা বোঝা যায়। এক তাঁর গল্প বলার আদল, দুই প্রাজ্ঞল ভাষা। ‘শঙ্খ-কক্ষণ’ গল্পটি সর্বজ্ঞ কখন পরিস্থিতিতে গল্পটি বর্ণিত।

রাজা ভূপ সিংহের বয়স্য ভট্ট নাগেশ্বর এই গল্পের কথক। গল্প বলতে সে পটু। শ্রোতা পেলেই গল্প বলে। এক্ষেত্রে ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের বৃদ্ধ মোঙের কথা স্মরণে আসে।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ নামটিও বেশ ইঙ্গিতার্থক। গল্পে ‘দক্ষিণাবর্ত শঙ্খে’র কথা জানা যায়। কল্যাণ, মঙ্গল ও সৌভাগ্যের প্রতীক এই শঙ্খটি। গল্পের মধ্যেও এই শঙ্খটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী। কারণ গল্পের শুরুতে ভূপ সিংহের স্ত্রীর হাত থেকে পড়ে গিয়ে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটি ভেঙে যায়। ফলে ভূপ সিংহের পরিবারে অকল্যাণ ও ভাগ্য বিপর্যয় নেমে আসে। পূর্বে সে কথা বলা হয়েছে। গল্পে দেখা যায় যে, পুনরায় দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ এনেছে। কতেই আবার ভূপসিংহের পরিবারে শুভদিন ফিরে বসেছে। গল্পকারের কথায়— “সতেরো বছর পূর্বে রাণীর হস্তচ্যুত দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তারপরেই আসিল সর্বনাশা বিপর্যয়। আজ আবার অযাচিত ভাবে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আসিয়াছে এক অজ্ঞাত কুলশীল যুবক; ... এ কি নিয়তির ইঙ্গিত? তবে কি সত্যই শুভকাল ফিরিয়া আসিয়াছে।” তাই গল্পের কাহিনি ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ নামটিও সার্থক।

‘রেবা রোধসি’ গল্পটি ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পেরই প্রতি গল্প দু’টির মধ্যে মিলও অনেক। আলাউদ্দিন খিলজীর সময়কাল গল্প দু’টির পটভূমি। দু’টি গল্পেই যথাক্রমে আলাউদ্দিন খিলজী ও মালিক কাফুরের রাজ্য বিস্তার এবং ক্ষমতার দস্ত দেখানো হয়েছে। গল্প দু’টির মূল উপজীব্য বিষয় হিন্দু রাজা ও তুর্কো মুসলিম সুলতানের দ্বন্দ। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পে আলাউদ্দিন খিলজীর উচ্ছৃঙ্খলতা, কদর্যতা, ব্যভিচারিতা ও কুটিল রাজনীতি-কৌশলের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরের তেমন কোনো বীরত্বের কথা পাই নি। ফলে লেখক সুকৌশলে মালিক কাফুরের দক্ষিণাত্য বিজয়-প্রসঙ্গ নিয়ে ‘রেবা-রোধসি’ লিখলেন। আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে দু’টি গল্প পাঠে জানা যায়, কাহিনির শুরু আর মালিক কাফুরের হাতে শেষ। আবার, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ গল্পে ময়ূরের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি টান নেই কিন্তু ‘রেবা রোধসি’ গল্পে নির্বাসিত যুবরাজের মধ্যে তা দেখা যায়—উভয় গল্পের মধ্যে এই একটুখানি যা পার্থক্য। দুই যুবরাজের মিলও দেখি। আটরিক মানুষরাই ভাগ্য তাড়িত যুবরাজদের সাহায্য করেছে। নাগরিক জীবন থেকে বাইরে প্রকৃতির লালিত সহজ সরল মানুষের প্রেম ভালোবাসা তাদের জীবনকে অভূতপূর্ব বদলে দিয়েছে।

“শেষ পর্যন্ত রাজ পুত্র তুণীরবর্মাকে রাজ্য হইতে নির্বাসন দিতে হইল।” শরদিন্দুবাবু স্বভাবসিদ্ধ প্রকরণ-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন এই গল্পটিতে। এটি তাঁর পূর্বাপর গল্পগুলিতেও দেখা যায়। লক্ষণীয়, গল্পে ক্রিয়ার কারণ গল্পের শুরুতে না বলে ক্রিয়ার ফলটাই বলা হয়েছে। তুণীরবর্মা হ’ল রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভ জাত চতুর্থ সন্তান। তুণীরবর্মাকে ঘিরেই

প্রাথমিক পর্যায় থেকে চরমতমক্ষণ পর্যন্ত গল্পের সঞ্চার ও ক্রমপরিণতি। তুণীরবর্মা স্বাধীনচেতা যুবরাজ। সে কারো শাসন শোষণ মানে না। সে আরও বলশালী ও সুন্দর হয়ে ওঠে। গল্পকারের বর্ণনায়— “উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া উঠিলেন। ... জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।” এই উদ্দামতাই তুণীর বর্মার জীবনের পতন ডেকে আনে। প্রবল উন্মত্ততাবশত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রীকে হরণ করার অপরাধে তাকে নির্বাসিত হতে হয়। ইন্দ্রবর্মার সহানুভূতির কথায় তুণী বলে ওঠে— “মাতৃভূমি! মহেশ গড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু।” রাজ্য থেকে নির্বাসিত তুণীরবর্মা নর্মদা নদীর তীরে রাত কাটিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করলে একদল আটবিক শ্রেণির তরুণীর সাক্ষাৎ পায়। রেবা নামের তরুণীটি তুণীরের গলে মালা পরিয়ে দেয়। গল্পে এই ব্যাপারটি কিছুটা আকস্মিক। কারণ রেবার সঙ্গে তার কোনো পূর্ব সম্পর্ক নেই অথচ তুণীরবর্মার দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বরমাল্য পরিয়ে দেওয়াটা গল্পের সংহতি নষ্ট করলেও এটা একটা চমক। লেখক তুণীরের আশ্রয়দাতৃ হিসেবে রেবাকে দাঁড় করিয়েছে। তুণীর রেবার কাছে থাকতে শুরু করে। রেবাকে নিয়ে ঘর-সংসার শুরু করে। একদিন রেবার সঙ্গে তুণীর শিকারে গিয়ে শুনতে পায়, একদল বহিরাগত স্লেচ্ছ সৈনিক দক্ষিণাত্য বিজয় শেষ করে উত্তরের ছোট ছোট রাজ্যগুলি আক্রমণ করতে চায়। মালিক কাফুরের নির্দেশে তারা লুণ্ঠন চালায়। মালিক কাফুর তাদের প্রধান। রেবা ও তুণীরবর্মা অতি সংগোপনে বৃক্ষে রাত কাটিয়ে স্লেচ্ছ সৈনিকদের গোপন অভিসন্ধি ধরে ফেলে। তার মাতৃভূমিও আক্রমণ ও দখল করবে, এই চিন্তায় সে চিন্তিত। অশ্রু বাড়িয়ে পরে। স্বদেশভূমি রক্ষায় সে বিচলিত হয়ে পড়ে। কীভাবে স্লেচ্ছদের হাত থেকে পিতৃরাজ্য রক্ষা করবে—এই চিন্তায় সে মগ্ন। আক্রমণ করার পূর্বেই খবরটা জানানো চাই। ফলে কর্তব্যের টানে তুণীর রেবাকে ছেড়ে নদীতে গা ভাসিয়ে দেয়— “ওই নদী আমাকে পৌঁছে দেবে। রেবা কেঁদো না, যদি বেঁচে থাকি, আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।”

‘রেবা রোধসি’ গল্পটিতে ইতিহাস-প্রসঙ্গ নামমাত্র। ইতিহাস বড় হয়ে ওঠেনি বলেই গল্পটি পাঠককে আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য— “শঙ্খ-কঙ্কণের (পুস্তক) মধ্যে ইতিহাসের ছাপ প্রথমটাতে খুবই আছে এবং বিশেষ উপভোগ্য। দ্বিতীয়টিতে (রেবা রোধসি) খুব বেশি না থাকিলেও একটি জাতীয় আদর্শের পটভূমিকায় কাহিনীটি খুবই উপভোগ্য। —”^{১৪} গল্পে মালিক কাফুর ও আলাউদ্দিন খিলজীর কথা-প্রসঙ্গের সঙ্গে ইতিহাস নগন্য। সমস্ত গল্পটাই লেখকের কল্পনার ফসল। কল্পনা এখানে মুখ্য। কারণ লেখক কোনো কিছুর মূল্যে রাজপুত্রদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের ফলশ্রুত জানালেও জাতীয় আদর্শ থেকে যে রাজপুত্ররা

কখনো বিচ্যুত হয় না—মানুষ ঘোলামেলাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু রাজগৌরব তুণীরবর্মার জীবনে এনেছে চরম দুর্দশা। ফলে সে উদ্ভাস্ত হয়েছে। লক্ষণীয় তুণীরবর্মা আটবিক শ্রেণির নারীর ভালবাসা পেয়ে স্বাধীন ভাবে থাকতে চেয়েছে। তার চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষণীয় ও নারীর প্রেম ভালবাসা তাকে বদলে দিয়েছে। ভালবাসা কি, স্নেহ কি রেবার প্রেম থেকেই সে অনুভব করেছিল। তাই মাতৃভূমির প্রতি তাঁর প্রেম জন্মেছে। নদীতে সাঁতার কেটে মাতৃভূমিকে রক্ষার্থে শত্রুর আক্রমণের কথা। নিজের জীবন সংশয় জেনেও প্রিয় রেবাকে ত্যাগ করে সে ছুটে গেছে দেশরক্ষার তাগিদ নিয়ে। মাতৃভূমি, মাতৃসম — তাই সে মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ছুটে গেছে। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত যেকোনো মানুষই স্বদেশের কথা ভুলতে পারে না। আজন্ম লালিত মাতৃভূমিকে কেউ কোনো দিন বুলতে পারে না; নারীর টান সে অনুভব করবেই।

জাতীয় আদর্শের প্রতি মোহ কীভাবে জন্মাতে পারে সেই বিষয়টিই লেখক এ গল্পে বর্ণনা করেছেন। গল্পটিতে ইতিহাস-প্রসঙ্গ নামমাত্র থাকলেও শুধুমাত্র গল্পের প্রয়োজনে ইতিহাসকে তিনি এনেছেন। জাতীয় জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠাই গল্পটির মূল উপজীব্য।

অন্যদিকে ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পে গোলাম কাদেরের স্মৃতির সূত্রে কথক জাতিস্মরণতায় ডুব দিয়েছেন। অপরিচিত ফিরিঙ্গীকে দেখেই কসাইখানার দোকানদার গোলাম কাদেরের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল পূর্বজন্মের স্মৃতি, অতীত জীবনের দুর্বিষহ অসহায় করণ মৃত্যুর কথা, স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ পিতার মুখচ্ছবি। বর্তমান জীবনে কসাইখানার দোকানদার গোলাম কাদের রূপে জন্মে অপরিচিত ফিরিঙ্গীর সাক্ষাৎ লাভ করে পূর্বজীবনের ক্রিয়া-কলাপ জানতে পেরেছে। ফলে ওই অপরিচিত ফিরিঙ্গীকে দেখে ছুরি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়। এই ঘটনাটি গোলাম কাদেরের একালের ঘটনা। গোলাম কাদেরের ভাষায়— “গোলাম কাদের বলিল, বাবুজী, আমার এই কাহিনী আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি যে পাগল নই — আমার এই কথাটি আপনি অবিশ্বাস করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি কিতাব পড়ি নাই, আজীবন মাংস বিক্রয় করিয়াছি। গল্প বানাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যাহা আজ বলিব, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বলিব। অথচ এ সকল ঘটনা আমার — এই গোলাম কাদেরের জীবনে যে ঘটে নাই, তাহাও নিশ্চিত। আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব জানি না, আমি মূর্খ লোক। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহা আজিকার ঘটনা নয়, বহু বহু যুগের পুরাতন।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩)

গোলাম কাদেরের কথায়, পনের-ষোল বছর আগে তার স্ত্রী এক কন্যা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মরে যায়, হতভাগ্য কন্যা সন্তানটিও একই সঙ্গে মরে। তারপর তার মনে সংস্কার চেপে

বসে— কোনো শত্রুমন তার স্ত্রী-কন্যাকে নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ছিল। সেদিন শোকের চেয়ে রাগে প্রতিহিংসায় তার গা জ্বলছিল। সেই ঘাতককে পেলেই যোগ্য জবাব দেবে। সংস্কারগত এভাবে কিছুদিন কাটার পর তার মনে হয়েছিল এসব মিথ্যা; তাই সে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগল। তারপর শেষ পর্যন্ত জীবনটা ওভাবেই কাটতো যদি না সেই কুম্ভণে সেই ফিরিঙ্গীটি তার কসাইখানায় না আসতো। গোলাম কাদেরের কথা—

“শুনিয়াছি, মানুষ জলে ডুবিলে তাহার বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মতো চোখের পর্দার উপর দেখিতে পায়। এই লোকটাকে দেখিবামাত্র আমারও ঠিক তাহাই হইল। এক মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইলাম — এই সেই নৃসংশ রাক্ষস, যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। ছবির মতো সে সকল দৃশ্য আমার চোখের উপর জাগিয়া উঠিল। মজ্জমান জাহাজের উপর সেই মরণোন্মুখ অসহায় যাত্রীদের হাহাকার কানে বাজিতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামার সেই ক্রুর হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪)

গোলাম কাদেরের কসাই জীবন-ইতিহাসের পটভূমিকায় ছেদ পড়ে এবং তারপর সে যার কথা বলতে শুরু করেছে তার নাম মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্দীকী। গোলাম কাদের গল্প-শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলেছে আমি যে মির্জা দাউদ তা ভুলুন। বর্তমান জীবনে যে গোলাম কাদের নামে পরিচিত ব্যক্তি সেই-ই অতীত অর্থাৎ পূর্বজন্মে মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্দীকী নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে বর্তমান জীবনে গোয়া থেকে আগত ফিরিঙ্গীটি হ'ল ভাস্কো-ডা-গামা। মির্জা দাউদ জাতিতে মূর, আর ভাস্কো-ডা-গামা পর্তুগীজ বণিক। কালিকটের বন্দরে উভয়ের দেখা। ঘটনার সূচনা ও ক্রমপরিণতি এই দু'জন শ্রেষ্ঠীর জীবন-কাহিনিকে অবলম্বন করে। কালিকটে মির্জা দাউদ -এর শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ ইসলামী রীতিতে তৈরি। সুদূর মরক্কো দেশে এখনও পিতা জীবিত। কিন্তু তিনি সুদীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে কালিকটকেই মাতৃভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ধর্মে তিনি মুসলমান হলেও এক পত্নীক। এতে তাঁর নিষ্ঠুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পত্নীর নাম শালেহা। একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। যেকোনো মির্জা দাউদের মতো সর্বজন সম্মানীয় ব্যক্তি দ্বিতীয়টি নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে সম্মান করেন। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁকে বন্ধুর জায়গায় স্থান দিয়েছেন। দিনের পর দিন ব্যবসায় প্রচুর লাভ হচ্ছিল। সব মিলিয়ে সুখী জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি। বিদ্যায়ও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাই।

পর্তুগীজ বণিক ভাস্কো-ডা-গামা অতিশয় ধূর্ত ও চতুর। অসিবিদ্যায় নিষ্ঠুরতায়

প্রতিহিংসাপরায়ণতায় পারঙ্গম লুঠ করতেও সে সমান দক্ষ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিপরীতধর্মী দু'টি চরিত্রের বৈপরীত্যের ছবি এঁকে তাঁদের জাতীয় জীবন ও ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। ক্ষমতা ও সম্পত্তি দখলের নেশায় পরস্পর বাক্যুদ্ধ ও শেষে অনিয়ুক্ত কালিকটকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে।

ভাস্কো-ডা-গামা অসি-চালনায় পরাস্ত হয়। মির্জা দাউদ তাকে ইচ্ছে করলেই মেরে ফেলতে পারতো কিন্তু তা করেনি। দেশ ছাড়ার অঙ্গীকারে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভাল মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে মরতেও হয়। কথায় বলে শত্রুর চিহ্ন রাখতে নেই।

মির্জা দাউদ স্ত্রী-কন্যা বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে মক্কা শরীফ দর্শন করলেন। তারপর সকলে মিলে কালিকট হয়ে ফিরছিলেন। সমুদ্রে পোর্তুগীজ জলদস্যুরা তাদের জাহাজ ঘিরে ফেলে। ভাস্কো-ডা-গামা এই দস্যুদলের নায়ক। মির্জা দাউদকে এবার ভাস্কো-ডা-গামা আর কোনো সুযোগই দিল না। সমস্ত ধনরত্ন দেওয়া সত্ত্বেও ভাস্কো-ডা-গামার অকারণ নিষ্ঠুরতায় জাহাজ শুদ্ধ লোক প্রাণ হারল।

পোর্তুগীজ দস্যুদের কামানের গোলায় মির্জা দাউদের জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। একে একে তার কন্যা-স্ত্রী ও পিতার মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। “ভাস্কো-ডা-গামা তখন স্বয়ং ধূমায়িত বন্দুক হাতে করিয়া পিশাচের মতো উচ্চ হাসি হাসিতেছে।”

সূর্য পশ্চিম আকাশ ছোঁয় ছোঁয় আকাশ এবং সমুদ্র গরম রক্তের ন্যায় রাঙা হয়ে উঠেছে। পোর্তুগীজদের কামানের গোলায় জাহাজ এবার ধীরে ধীরে সমুদ্র গর্ভে বিলীন যাচ্ছে। যাত্রীদের অসহায় মৃত্যু দৃশ্য লেখকের বর্ণনায়—“যাত্রীদের উর্ধ্বাখিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তপূর্বে যেখানে জাহাজ ছিল, সেখানে আবর্তিত তরঙ্গশীর্ষ জলরাশি ক্রীড়া করিতে লাগিল।”

পোর্তুগীজদের কামানের গোলায় মির্জা দাউদ ও তাঁর পরিবারের নিরীহ মানুষদের রক্তপাত সমুদ্রের জলকেও রক্তবর্ণ করে তুলেছে। সূর্যাস্তের রঙ আর সমুদ্রের রক্তবর্ণ জল সমধর্মী হয়ে উঠেছে। ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পটিতে সে ভাষাই ব্যক্ত হয়েছে। এতাই ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ নামটি বহন করে কথাকারের ভাষায়—“সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্ত রেখা স্পর্শ করিয়াছে। আকাশ এবং সমুদ্র তপ্ত রক্তের মতো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাগরবক্ষে সূর্যাস্ত হইতেছে। সূর্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন নূতন গগনে উদিত হইয়াছে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, পৃ. ৪৮-৪৯)

প্রধানত পঞ্চদশ শোড়শ-শতক ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পটির পটভূমি। ভাস্কো-ডা-গামা, কালিকট প্রভৃতি নাম তার সাক্ষ্য দেয়। গল্পটি বর্ণনাধর্মী হলেও গল্পের ঘটনা, সরস ভাষা পাঠককে আকর্ষণ করেছে। শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষায় সংস্কৃতজাত তৎসম শব্দ ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ থাকলেও ঋজু

ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। রসাবেদনের নিরিখেও গল্পটির সার্থকতা লাভ করেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ‘রক্ত-সন্ধ্যা’য় ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ‘ফিরিঙ্গী বণিকে’র সাহায্য নিয়েছিলেন তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও শরদিন্দু রচিত ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ নামক গল্পে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জলপথে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনের বিষয়টি দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হয়েছিলেন। ‘পদসঞ্চার’ উপন্যাসটি তারই ফসল। মির্জা দাউদ ও ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র-চিত্রণে লেখকের পরিণত মানসিকতার ছাপ বর্তমান। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ঘটনার অনুসারী রূপে অঙ্কিত এই চরিত্র দুটি। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথমনাথ বিশীর স্মরণযোগ্য—

“... ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘চুয়াচন্দন’ গল্প দুইটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে। ভাস্কো-ডা-গামার আমলের গোয়া নগর এবং তথাকার লোকজন এমন জীবন্ত ভাবে লেখক আঁকিয়াছেন যে তাঁহাকে প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। হয়তো এসব তথ্য তিনি ইতিহাস হইতে পাইয়াছেন কিন্তু এ প্রাণ তো ইতিহাসের গ্রন্থে ছিল না।”^{১৫} যথার্থই বলা যায়, শরদিন্দুবাবু ইতিহাসের প্রকৃত মেজাজকে এগল্পে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। শরদিন্দুবাবু রবীন্দ্রোত্তর ও অতীত অনুসারী হলেও বর্তমানের মেজাজ ও প্রবণতাটিকে তিনি ভোলেন নি। এ প্রসঙ্গে প্রথমনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

“... কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের, গল্পের যে ফ্রেমটির মধ্যে এই গোয়া নগরের কাহিনীকে তিনি আঁটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার এক মাংস বিক্রেতা ও গোয়া নগর হইতে আগত এক পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গীর খুনোখুনীকে লেখক অপূর্ব প্রতিভাবলে বহু শতাব্দীর পূর্বেকার ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদের সঙ্গে জড়িত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি বলে, ইহা অসম্ভব; সংস্কার বলে — সম্ভব হইতেও পারে। বিজ্ঞান বলে, ইহা মিথ্যা; আর্ট বলে, ইহা সত্য। লেখক গল্প লেখায় আর্টের সাহায্যেই ইহা সত্য করিয়া তুলিয়াছেন; পড়িবার সময়ে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।”^{১৬}

প্রথমনাথ বিশীর এই মন্তব্য অতিশয় যথার্থ। কাহিনি নির্মাণ, অতীতের প্রেক্ষাপট তৈরি, চরিত্র চিত্রণ এবং ভাষাবোধ তাঁর শিল্পকুশলতার প্রধান গুণ। আসলে শরদিন্দু যথার্থ আর্টিস্ট। বলা যায় ব্যক্তি শরদিন্দু হলেন স্টাইলের বাহক।

ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম সরস গল্প হ’ল ‘চুয়াচন্দন’। শরদিন্দু কৃত এই গল্পটিতে ইতিহাসের অনুষঙ্গ কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু হয়ে উঠেনি। বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক বড় হয়ে উঠেছে ইতিহাসকে ছাপিয়ে। মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি পাঠে চৈতন্যদের সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে আমাদের। কিন্তু ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটিতে লেখক কিশোর নিমাইয়ের প্রথম জীবনকে ংকেছেন মধ্যযুগীয় চৈতন্য-দেবের পরিচয়ের বাইরে গিয়ে। ‘চুয়াচন্দনের’ পটভূমি ১৫০৪ অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। নিমাই পণ্ডিতের বয়স যখন আঠারো

বছরের নিমাইকে নিয়ে এই চমৎকার গল্পটি লিখলেন। গল্পটি রচনায় প্রাক-মুহূর্তের চিন্তায় লেখকের উৎসাহের বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে— “চুয়াচন্দন লিখে (খুব তৃপ্তি) হয়েছিল। মুঙ্গেরে স্কুলের টিচার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই পড়তে দেন। সেটি পড়েই চৈতন্যের গোড়ার জীবন নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। চুয়াচন্দন ছ’বার লিখেছিলাম। যতক্ষণ না লিখে তৃপ্তি হচ্ছে শান্তি নেই।”^৭

কিশোর নিমাই ও তাঁর আমলের কাহিনি চিত্রাঙ্কনে গল্পটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। আমরা জানি নিমাই পণ্ডিত পরবর্তীকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নামে পরিচিত হন। এমনকি ভক্তের চোখে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; তিনি অবতার স্বয়ং ভগবান। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব মানুষকেই প্রেম বন্যায় ভাসিয়েছেন চৈতন্যদেব। আদিজ-চণ্ডালকে কোলে তুলে নিয়েছেন। হরে কৃষ্ণ, হরে মধুর কৃষ্ণ ধ্বনিতে মানুষকে প্রসন্ন করেছেন। জগাই-মাধাইকেও মাপ করেছেন। উল্লেখ্য, কাজী সাহেবও চৈতন্যের সঙ্গে সাধ দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলায় ষোড়শ শতকের ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার দিনে পরিত্রাণ কর্তা তথা নররূপী নারায়ণ হিশেবে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। চৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কারক মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নিমাই পণ্ডিতের সন্ন্যাস জীবন ও ধর্ম সাধনার কথা সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আপামর কাছে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি চৈতন্যদেবের স্বরূপ সম্পর্কে যথাযথ ধারণার পরিচয় দেয়— “শ্রীচৈতন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি যুগের প্রতিনিধি—শুধু একটা যুগের প্রতিনিধি নন, সর্বযুগের প্রেমভক্তি, ত্যাগ-তীক্ষ্ণতার একমাত্র প্রতীক বলে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।” (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০১-২০০২, পৃ. ৮০) পূর্বেই বলেছি শরদিন্দুবাবু চৈতন্যদেবের গোড়ার জীবন নিয়ে আলোচ্য ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটি রচিত। ফলে চৈতন্যদেব সম্পর্কে মানুষের চিরাচরিত ভাবনার বদল ঘটেছে। নিমাই পণ্ডিত এখানে বুদ্ধিদীপ্ত প্রগতিশীল চরিত্র। শুধু কি তাই? তাঁর সহাস্য কৌতুকময় তার দিকটিও আমাদের আকর্ষণ করে। বিষুগপ্রিয়ার চরিত্রও উদার ও স্নেহশীল। চরিত্রটি এখানে কিছুটা প্রগল্ভ। লেখকের কথায়— “তৈল-মসৃণ পণ্ডিতদের তর্ক ও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। একজন অতি গৌরবাস্তি যুবা বয়স বিশ বছরের বেশি নয় — তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরূপ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক এক সঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।”

প্রাসঙ্গিকভাবে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটিও যথার্থ—

“চুয়াচন্দন চৈতন্যদেবের আমলের নদীয়ার একটি কাহিনী। যেমন রোমান্টিক তেমন

বাস্তব; কিন্তু ইহার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে কিশোর চৈতন্যের চিত্রটি, চৈতন্যদেবের যে মুণ্ডিত মস্তককৌপীন সম্বল মূর্তির সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত, এ চিত্র সে চিত্র নয়। এ সেই দুর্দান্ত বিদ্বান, মূর্খ পণ্ডিতদের মূর্তিমান ভয়স্বরূপ, দেব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, এক ডুবে গঙ্গাগর্ভ নিমজ্জিত-পণ্ডিতদের টিকি ধরিয়া টানিয়া তোলা, প্রচুর হাস্যে প্রগল্ভ সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী চৈতন্যদেবের চিত্র। চৈতন্যদেব যে এমন ছিলেন তাহা কোন কোন বৈষ্ণব লেখকের জীবনী হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে সে ছবি দেখি নাই। যে চৈতন্য একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, তিনি আবার একদিন অন্ধকার রাত্রে মাঝগঙ্গায় চন্দনের সহিত চুয়ার রাক্ষস-বিবাহ দিয়াছিলেন এমনতর মিথ্যা-সত্য ইহার আগে পড়ি নাই। যাঁহারা চৈতন্যদেবের গতানুগতিক চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিলে চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া উঠিবেন, আশা করিতেছি।”^{১৮}

কিশোর সহাস্য প্রগল্ভ অথচ বিদ্বান নিমাই পণ্ডিত সমাজে জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপকে উপেক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। জমিদারের অত্যাচারী ভাইপো মাধবের কামনার দৃষ্টি এবং ব্যভিচারী মিথ্যাচারী থেকে তান্ত্রিকের দেহ সাধনার করাল গ্রাস থেকে ষোড়শী কন্যা চুয়াকে উদ্ধার করে রূপচাঁদ সদাগরের পুত্র বণিক চন্দন দাসের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস পরবর্তী এই কাজ সম্ভব নয়। ফলে গল্পকার শরদিন্দুবাবু মনস্থির করেছেন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-পূর্ব কিশোর জীবনকে নিয়ে গল্প রচনা করা। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ছোঁয়ায় ইতিহাসকে পটভূমি করে সেকালের সামাজিক চিত্রকে অনবদ্যভাবে আমাদের কাছে উপভোগ্য করে তুলেছেন। অন্য এক ব্যতিক্রমী চৈতন্যদেবকে পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তিনি। গল্পটির কাহিনির আকর্ষণ সর্বস্তরের পাঠককে আকর্ষণ করে।

নদীয়া নগরের ধর্মীয় পরিবেশে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তार्কিক, ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত, মুণ্ডিত মস্তক, টিকিধারী গৌঁসাই-তন্ত্রের কথা। পাণ্ডিত্যের শুষ্ক-আস্ফালন দাপটই তাদের পুঁজি অবলম্বন। কখনো কখনো তর্ক এমন মাত্রায় পৌঁছে যায় যে, দেশে অরাজক অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। গৌঁসাই-তন্ত্রের চিরাচরিত ধারাকে কৌতুককর করে তুলেছেন। সমাজে গৌঁসাই-পণ্ডিতদের বাড়াবাড়ি শরদিন্দুবাবু ভালভাবে নেননি। প্রকৃত গৌঁসাই তাঁর কাম্য ছিল। ফলে শরদিন্দুবাবু বাসুদেব সার্বভৌমকে গল্পে এনে গৌঁসাই পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারের জবাব দিয়েছেন। বাসুদেব সার্বভৌম প্রকৃত অর্থে পণ্ডিত, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। মূলত নবদ্বীপে তিনি আসার পর থেকেই প্রকৃত জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়। কিশোর নিমাই পণ্ডিতও তार्কিক গৌঁসাইদের উপযুক্ত

জবাব দিয়েছেন। আচার সর্বস্বতাও রক্ষণশীলতা এই জাতীয় গৌঁসাইদের মূল মন্ত্র। ফলে নিমাই পণ্ডিতকে তারা ঈর্ষ্যা ও ভয়ের চোখে দেখে। বলা যায়, লেখক নদীয়া নগরে তথা বাংলার সমাজ পরিবেশে প্রকৃত ধর্মের নীতি-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরণের গল্প রচনা করেছেন। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল, অজাচার তা তিনি মানতে পারেন নি। গল্পের তার পরিচয় পাই— “মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উথিত হইয়াছে — তাহাই আকর্ষণ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ মত্ততায় অধঃপথের পানে স্থলিত পদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অজাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? যাহারা শক্তিমান, তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চ-মকার উদ্দামনৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১১৮) সমাজে শক্তিমান মানুষেরাই যখন এই খেলায় মত্ত তখন সাধারণ মানুষকি বাদ পড়বে? লেখকও সেই প্রশ্নই এখানে উত্থাপন করে সেদিনের অরাজক, উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের গ্লানিময় দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তন্ত্র সাধনার মূল উপজীব্য বামাচারী। নারী সাধনাই একমাত্র কাম্য। দেহ ও মন্ত্রই তন্ত্রসাধনার রাজ কর্ম। লেখক গল্পে মাধাই ও চাঁপাকে এনে সেই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই ঘটনার বিপ্রতীপে সদর্শক মানসিকতার ছাপও বর্তমান। কদাচার, সজাচার ভ্রষ্টাচারমুক্ত সমাজ পরিবেশ গঠনের কথাও এগল্পে ধরা পড়ে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকটিই কাম্য। ফলে গল্পটিতে সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যশালী বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় পাই। সংস্কৃতির আদান-প্রদানে বাংলার ভূমিকায় যথেষ্ট। প্রাচীন সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার উচ্চমানের পীঠস্থান মিথিলার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক সুদীর্ঘ দিনের। মিথিলায় গিয়ে বঙ্গজ সন্তানের বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রচর্চা করতেন তার পরিচয়ও গল্পে পাই। শরদিন্দুবাবুর মৈথিলি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কথা জানা যায়। বিশেষত বিদ্যাপতির ‘বৈষ্ণবপদ’ তাঁকে আকর্ষণ করে। ‘চুয়াচন্দনে’র একটি ঘটনার জন্য বিদ্যাপতি ঠাকুরের কাছে লেখকের ঋণী থাকবার কথাও জানা যায়—

“তঁহি পুন মোতি-হার টুটি পেলল

কহত হার টুটি গেল।

সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু

শ্যাম দরশ ধনি কেল।”^{১৯}

তাছাড়াও ‘চুয়াচন্দন’ গল্পে বিদ্যাপতির কয়েকটি ‘পূর্বরাগে’র পদ পাই। এখনও যাদের ব্যবহার গলেপের মূল কাহিনিকে তরাণিত করেছে। উল্লিখিত ছুয়া সম্পর্কে অনুরাগ ও আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

পদগুলি ব্যবহারে গল্পের কাহিনিও অনেকটা মোড় নিয়েছে।

গল্পের পটভূমিকা হিশেবে পাঠান আমলের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের চিত্র পাই। গল্পে বণিকপুত্র চন্দনদাসের কথায় সে বিষয়টিই উঠে এসেছে। চন্দনদাস বাণিজ্য থেকে ফিরে আসার সময় নবদ্বীপ ঘাটে নেমে নগর ভ্রমণে বের হয়ে ষোড়শী চুয়াকে দেখে আকৃষ্ট হয়। এমনকি আবেগ সম্বরণ করতে না পেরে চুয়ার বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে। চুয়াচন্দনের কাহিনি এখানে ইতিহাসের খোলস ত্যাগ করে সাধারণ নরনারীর ভাললাগা-মন্দলাগার কাহিনি হয়ে উঠেছে। প্রেমের আকর্ষণে চন্দনের মানসিক পরিবর্তনের পরিচয় পাই। শেষ পর্যন্ত চুয়া সম্পর্কে সমস্ত ঘটনা জেনে চুয়াকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছে। জমিদারের ভাইপো মাধব অত্যাচারী। সে সবাইকে ভয় দেখায়। মানুষের ক্ষতি করতে তার দ্বিধা নেই। স্বচ্ছাচারী, অসহিষ্ণু। তদুপরি চন্দন দাস সব কিছুকে উপেক্ষা করে চুয়াকে উদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও কৌশলকে আশ্রয় করে নিমাইয়ের সহযোগিতায় চন্দন দাস চুয়াকে উদ্ধার করে বিয়ে করে। স্বয়ং নিমাই পণ্ডিতই ছিলেন এই শুভ কাজের পুরোহিত।

নিমাই চরিত্রটি অত্যন্ত Dynamic এবং active। চুয়া ও চন্দনদাসের বিয়ে দিয়ে সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি প্রগতিশীল সমাজ গঠনের কাজটি করেছেন তিনি। আধুনিক মনন নিয়ে একটি কিশোরী মেয়ের কথা ভেবে তার বিয়ের ব্যবস্থা করাটা নিমাইয়ের সামাজিক কাজ বলে মনে হয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালের ২৭ জুলাই সিনেমা জগতে প্রবেশ করেন। চিত্র নাট্য লিখে উপার্জনও করেন কিছুটা। সিনেমার জন্য গল্প লেখার তাগিদ তাঁর মনে থাকা সম্ভব ছিল। সে জন্যই তাঁর লেখাগুলিতে চিত্র নাট্যের রূপ বর্তমান। ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটিতেও চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। গল্পটি একটু-আধটু বদল করলেই চলচিত্রের রূপ নিতে পারে। একজন প্রতিভাধর প্রযোজক ও কাহিনি লেখক তা করতেও পারেন।

প্রসঙ্গত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি সৃষ্টির কারণ হিশেবে জানিয়েছেন—“চুয়াচন্দন লিখে (খুব তৃপ্তি হয়েছিল। মুগ্ধেরে স্কুলের টিচার শশীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই পড়তে দেন। সেটি পড়েই চৈতন্যের গোড়ার জীবন নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। চুয়াচন্দন ছ’বার লিখেছিলেন। যতক্ষণ বা লিখে তৃপ্তি হচ্ছে শাস্তি নেই। চুয়াচন্দনের শাস্ত সুচিন্তিত প্রেমের আবেদন কল্পনার চুয়াচন্দনের কাহিনি বাস্তবরূপ ও পাঠককে আকর্ষণ করে। তিনি গল্পটি রমণীয় করে তুলেছেন ইতিহাসকে নামমাত্র ব্যবহার করে। ভাষাকে বাহক হিশেবে মনে করে শরদিন্দু তাঁর রচনা গভীর সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পটিতে সেই বৈশিষ্ট্য

লক্ষণীয়। (জীবন কথা : অমনিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড, শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, গল্প-পরিচয়, পৃ. ৪২৪) গল্পটি খুবই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল। নবদ্বীপের ও তাত্ত্বিকতার পটভূমিতে লেখা এবং বিস্মৃতপ্রায় বাঙালীর সুদূর দেশে বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী এই উভয়ে মিলিয়া যে একটি সুপারিকল্পিত কাহিনীকে খাড়া করিয়াছেন তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক।”^{২০}

বাঙালি জীবন ও বাঙালির ধর্ম, শিক্ষা, বাণিজ্য ও ধর্মের উচ্ছ্বলতা, নরনারীর প্রেম ইত্যাদি চমৎকার ভাবে চিত্রিত হয়ে উঠেছে ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটিতে। গল্পের নামকরণও যথার্থ। চরিত্রকেন্দ্রিক হওয়ায় গল্পের মর্মসত্য উজ্জ্বলরূপ পেয়েছে। তদুপরি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ হওয়ার কারণে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্নাতক পর্যায়ে) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গল্পটির মান বেড়েছে।

নিমাই চরিত্র লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব। নিমাই পণ্ডিতের বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি সহাস্য কৌতুকপ্রিয় নিমাই অধিকতর প্রাণবন্ত। চন্দনদাসের সঙ্গে চুয়ার মাতামহী বুড়ির সহাস্যকৌতুক বাচন ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। বুড়ি মিষ্টি মধুর কথায় বলে চন্দন দাস আকৃষ্ট হয়েছিল। কৌশলে চন্দনদাস কাজ হাসিলের লক্ষে নিজেকে বুড়ির নাতি বলে পরিচয় দেয়। চুয়াকে চন্দনদাসের গোচরে আনে। বুড়ির চরিত্র যুগপদ কৌশলী ও চতুর। বুড়ির কথাবার্তা শুনে চন্দনদাস ধীরে ধীরে চুয়ার প্রেমে পড়ে। অতঃপর চুয়া চন্দনের প্রণয়, উদ্ধার, বিবাহ ইত্যাদি ঘটনা গল্পটির পরিণতি। ‘চুয়াচন্দন’ গল্পটি একটি সার্থক প্রেমের গল্প হিশেবে ব্যাখ্যাত করতে পারি। কারণ গল্পে পাই চুয়া ও চন্দনদাসের প্রেম সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। পাশাপাশি চৈতন্যদেবের পৌরহিত্যে বিয়ের বিষয়টিও অতিশয় চমৎকার।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরদের নিয়ে ‘চুয়াচন্দনে’র পর শিবাজীকে কেন্দ্র করে ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটি রচনা করলেন। শিবাজীর জীবন ও কর্ম ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটির উপজীব্য বিষয়। ইতিহাস অনুষঙ্গ থাকলেও ইতিহাস প্রকট নয়। ইতিহাস গল্পের পটভূমি মাত্র। সময়কে নির্দিষ্ট ভাবে বোঝানোর জন্যই এতে ইতিহাস ব্যবহৃত হয়েছে। অতীত ইতিহাসকে সরিয়ে রাখলে এই জাতীয় গল্পে লক্ষ করা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব জীবনেরই কোনো না কোনো নিগূঢ় সত্য। ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটিতেও সে কথাই ব্যক্ত। শক্তি নয়, বুদ্ধি ও যুক্তিই বড় কথা। শিবাজীর চরিত্রে অন্তত সে সত্যই ধরা পড়ে। শিবাজীকে ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটিতে লেখক অত্যন্ত যুক্তিবাদী, প্রতিভাধর এবং দূরদর্শী চরিত্র রূপে এঁকেছেন। ‘চুয়াচন্দন’ গল্পের কিশোর নিমাই আর ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পের কিশোর শিবাজী একে অপরের দোসর। উভয়ের ব্যক্তিত্ব, সংস্কারমূলক মানসিকতা, সাহস ও নেতাজনোচিত মনোভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দু’জনকে একাননে বসিয়েছে। শরদিন্দুবাবু শিবাজীর কিশোর জীবনের ছবি আঁকতে জানান— “বাঘের বাচ্চা’র মূল

কথাটি Elphinstone এর History of India -র একটি পংক্তিতে পাওয়া যায়। অন্য কোথাও উহার উল্লেখ আছে কিনা জানি না। স্যর যদুনাথের ‘শিবাজী’তে কিছু নাই।”^{২১}

গল্পে কিশোর শিবাজীকে প্রধান উপজীব্য চরিত্র হিসেবে এঁকে গল্পের স্বাদ বকলে দিয়েছেন। কিশোর শিবাজীর অশ্বচালনায় দক্ষতা, দস্যুবৃত্তির নৈপুণ্যতা, ঘন জঙ্গল ও খাঁড়া পাহাড়ের প্রান্ত অশ্বদৃষ্ঠে পথ চলা রোমান্স কাহিনিকেই স্মরণ করায়।

ইতিহাসের যোদ্ধা শিবাজীর কিশোর জীবনের কথায় ধরা পড়ে শিবাজীর দক্ষতা ও শারীরিক ক্ষমতার কথা। কিশোর শিবাজীর শারীরিক গঠনের পরিচয় লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা সত্যিই চমৎকার। তাঁর মুখের গঠন অতিশয় তীক্ষ্ণ, শ্যামবর্ণ, বয়স প্রায় ষোল। পাশাপাশি তাঁর দৈহিক গঠনভঙ্গিটি অসাধারণ— মৃদঙ্গের মতো মুখ, তীক্ষ্ণ নাক, শিকারীর মতো উজ্জ্বল ঘন কালো চোখ। হঠাৎ তার মুখ দেখলে কঠিন ধারযুক্ত বাঁকা তলোয়ারের কথা মনে পড়ে। বেঁটে শরীরেও অত্যন্ত শক্তি। হাত হাঁটু পর্যন্ত। তেজী ও পেশীবহুল হাত ঘোড়ার পিঠে বসে মাটিতে হাত বাড়ালে পাথরও তুলতে পারে। শিবাজী সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

“ ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পে কিশোর শিবাজীর চিত্র পাওয়া যায়। কিশোর শিবাজীকে আমরা কোথাও দেখি নাই। শিবাজীর শরীরের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য রকমে বস্তুগত। শিবাজীর দেহের উর্ধ্বার্ধ যে নিম্নার্ধের অপেক্ষা সবল ও পুষ্ট ছিল, ইহা শরদিন্দুবাবু কোথাও পড়েছেন কিনা জানি না; কিন্তু শিবাজীর অশ্বারূঢ় চিত্র দেখিলেই এই কথাটি মনে হয়। বোধ হয় ইহা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্যেরও প্রতীক। শিবাজীর মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহার নিম্নার্ধ বা ভিত্তি অস্পষ্ট ছিল, ইহাই বোধ করি তাহার সবচেয়ে বড় কারণ। এই গল্পে আমরা দেখিতে পাই শিবাজীর human জ্ঞান ছিল। বোধ করি অধিক বয়সেও তিনি এ শক্তি হারান নাই। নতুবা আওরঙ্গজেবের কয়েদ হইতে সন্দেশের ঝুড়ি করিয়া পালাইবার বুদ্ধি তাঁহার মনে আসিত না।”^{২২}

শিবাজীর এহেন চরিত্র আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও গল্পের প্রয়োজনে রোমান্স বীরের বৈশিষ্ট্য আরোপ করায় তা হয়ে উঠেছে বিশ্বাসযোগ্য। গল্প বৃদ্ধের মুখ দিয়ে গল্প বলানোর রীতি শরদিন্দুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। ঘোড়ার পিঠ চলতে চলতে গল্প পিপাসু কিশোর শিবাজী বৃদ্ধ দাদোর কাছে গল্প শুনতে চায়— “এবার আমার মা’র বিয়ের গল্প বলো।” এর জবাবেই বৃদ্ধ দাদো গল্প বলতে শুরু করে। তোমার মা জিজা যদুবংশের কন্যা। দাক্ষিণাত্যে এরকম বংশ কমই আছে। প্রথানুযায়ী ‘ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী’ উৎসবে দোল পূর্ণিমার দিন

আবীর খেলা হ'ত। বংশ পরম্পরায় রাজপুত্র বংশে দোল-উৎসবে আবীর খেলার রেওয়াজ আজ অবধি চলে আসছে। উৎসবে সবাই যখন মত্ত, মদ্যাসক্ত আসক্ত ঠিক ঐ সময় দক্ষিণাত্যের হিন্দু সম্রাট লখুজীর কন্যা জিজার সঙ্গে তোমার বাবা শাহজীও আবীর খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে। পরস্পর পরস্পরকে মুখে-গালে আবীর রাঙিয়ে দেয়। আবীর মাথা শরীরে উভয়ে যখন সকলের সামনে যুগল মূর্তি রূপে উপস্থিত হয় তখন লখুজী সহসা বলে ওঠে— “লখুজী উচ্চ হাস্য করে উঠলেন, তারপর দু'টিকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে বললেন, ‘রাধা-গোবিন্দজী নয়, এরা আমার মেয়ে আর মালোজীর ছেলে। বন্ধুগণ, এ দু'টির বিয়ে হলে কেমন মানায় বলুন তো?’” পানাসক্ত লখুজীর এই কথার জবাবে তোমার ঠাকুর্দা মালোজী ভোসলে এক কৌশলের আশ্রয় নেয়—উপস্থিত সকলের সামনে বলে ওঠে — “মহাশয়গণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, লখুজী তাঁর কন্যাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বাগদত্তা করলেন।” — এতে লখুজীর নেশার ঘোর কেটে যায়। প্রচণ্ড ক্ষোভে বিরমিতে জ্বলতে থাকে এবং হুংকার দিয়ে বলে এত বড় স্পর্ধা মালোজীর — এটা তার কল্পনার অতীত। কিন্তু উপায় নেই লখুজী স্বয়ং উচ্চারণ করেছেন। সকল পারিষদবর্গ নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে লখুজীর সঙ্গে তোমার ঠাকুর্দার দ্বন্দ্ব বাঁধে। কেউ কারো ছায়া মাড়ায় না। লখুজী জিজার বিয়ের সম্বন্ধ অন্য দু'-এক জায়গায় স্থিরও করেছিল। কিন্তু তা হয়নি। এদিকে কিশোরী জিজার বয়স তেরোতে পা দিয়েছে। অনেক মনমালিন্যের পর জিজার পিতা লখুজী তোমার ঠাকুর্দাকে ডেকে জিজাকে পুত্র বধূর সম্মতি দেয়। অবশেষে তাদের বিয়ে হয়। এই জিজাবাই-শাহজীর কাহিনি লেখক অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছেন। এই ‘গল্পের মধ্যে গল্পটি’ পাঠককে আদ্যন্ত ধরে রেখেছে। শরদিন্দুবাবুর প্রায় বেশির ভাগ গল্পে ‘গল্পের মধ্যে গল্প বলা’ ভঙ্গিটি লক্ষণীয়— যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটিও এই গুণেই পাঠকের আকর্ষণ বাড়ায়।

গল্পের মধ্যে ঘন অরণ্যের যে অপরূপ ছবি পাই তা গল্পটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। গল্পের কাহিনি অনুসারী অরণ্যের বর্ণনা পাঠককে মুগ্ধ করে। গল্পে বর্ণিত দাদো কোণ্ডুর চরিত্রও অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তার সরস, সন্দিগ্ধ বাক্য ও স্নেহপূর্ণ আচরণ সত্যিই ‘দাদু-নাতি’র সম্পর্কের মধুরতাকে চকিতে হাজির করায়। মাওলী চাষা দেওরাম ও তার মেয়ে নুনা, বিণ্ডিয়া, তানাজী ছোট খাটো সব চরিত্রই উপযুক্ত রূপে অঙ্কিত। শিবাজীর মা জিজাবাই চরিত্রটি আড়ালে থাকলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবাজীকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সর্বোপরি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা শিবাজীকে মায়ের ভক্ত করে তুলেছে।

সপ্তদশ শতকে শিবাজীকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, ঔরঙ্গজেবের পতন, মারাঠা

জাতির আত্মজাগরণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে লেখা ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটি। ঐতিহাসিক উপাদান থাকলেও লেখকের ইতিহাস কল্পনার প্রাধান্যই বেশি। ফলে গল্পটি ইতিহাসের পটভূমিতে আটকে না থেকে কিশোর শিবাজীর দৃঢ়তা যুক্তিসিদ্ধ আচরণ, মানবিকতাবোধ ও বীরত্ব তার ব্যক্তিত্বের পরিচায় বহন করে। কিশোর বয়সে যে উচ্ছ্বাস আত্মফালন, বন্ধাহীন ভাবাবেগ ও যুক্তিহীন মনোভাব থাকে, তার বৈপরীত্যে লেখক শিবাজীকে অঙ্কন করে কিশোরদের পরিণত ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। গল্পটি কিশোরদের গল্প অন্যান্য শিশু কিশোর গল্পের তুলনা হলেও কৈশোরের প্রণবতাগুলি এতে নেই। ফলে গল্পটির আবেদন ব্যতিক্রমীধর্মী।

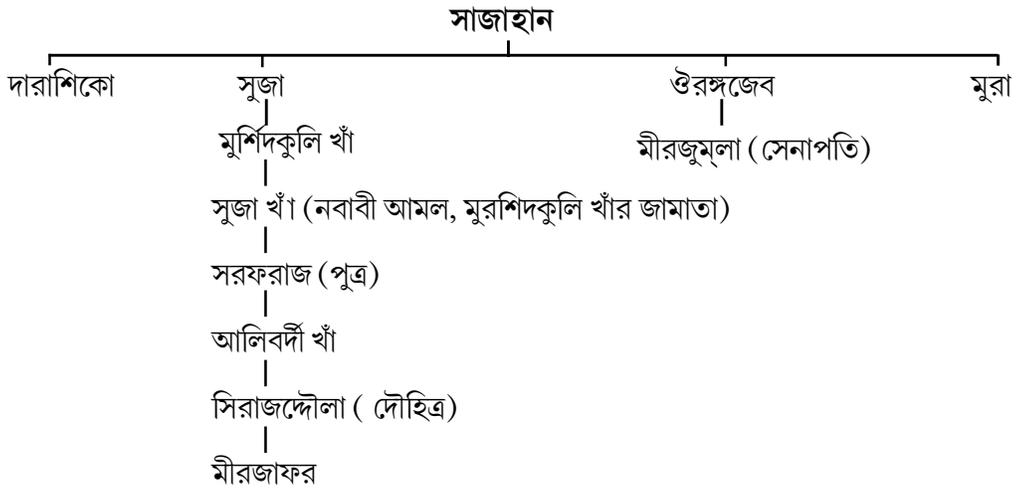
গল্পটির পটভূমি নির্বাচনে, চরিত্র-চিত্রণে, গল্প কৌশলে, গতিময় ভাষার ব্যবহারে ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটি শুধু শিশু কিশোরদের আকর্ষণ করে না যেকোনো স্তরের পাঠকের মন কাড়ে। মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাক— “‘চুয়াচন্দনে’র গল্পগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ‘বাঘের বাচ্চা’—একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ইহাকেই বলে 'reconquest of antiquity'। ইহা আপনার ঐতিহাসিক কল্পনার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন।”^{২৩}

শরদিন্দুর এই জাতীয় ইতিহাস-মূলক ছোটগল্পগুলিতে ইতিহাসের পাশাপাশি রোমাঙ্গরসের ব্যবহার লক্ষণীয়। রোমাঙ্গের ব্যবহার কখনো কখনো ইতিহাসকে লঘু করে দেখায়। যেমন— ‘রুমাহরণ’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘সেতু’, ‘মরু ও সঙঘ’ ও ‘বিষকন্যা’ ইত্যাদি। উল্লিখিত গল্পগুলিতে দূরাচারী অতীত ইতিহাসের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় রোমাঙ্গ ও আধুনিক রোমাঙ্গের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কিন্তু আলোচ্য ‘তক্ত মোবারক’ গল্পটি একটু অন্য ধরার। এখানে ইতিহাসই মুখ্য। ইতিহাসকে ঘিরেই গল্পের সূচনা, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। রোমাঙ্গের প্রসঙ্গ নেই এই গল্পে। লেখকও জানিয়েছেন— “‘তক্ত মোবারক’ ঐতিহাসিক কাহিনী। পূর্বে আমি যত ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিয়াছি, রোমাঙ্গই ছিল তাদের লক্ষ্য; তক্ত মোবারক গল্পে ইতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছি।”^{২৪}

মুঙ্গের গল্পটির পটভূমি। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে রচিত এই গল্পটির। মধ্যযুগের মোঘল নীতি ও মোঘল হারেমের ধারাভাষ্য কাহিনী এটি। একটি ‘তকত্ সিংহাসন’ তথা তক্তসিংহাসনকে অবলম্বন করে গল্পের সূত্রপাত। লেখক বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে এই সিংহাসনটি মঙ্গলময় বা কল্যাণকর কিন্তু গল্পে তার বিপরীত চিত্র বিদ্যমান। গল্পে সিংহাসনটি হয়ে উঠেছে অভিশপ্ত, ধ্বংসাত্মক ও নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনির প্রতীক। কারণ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের গ্লানি, কদর্যতা, ভ্রষ্টতা, নারীহরণ, নিষ্ঠুর হত্যা, বর্বরতা ইত্যাদি কালিমালিপ্ত ঘটনা ঐ সিংহাসনটির প্রত্যেকটি খোদিত পাথর সাক্ষী দেয়। পাশাপাশি নীরব, নিরুচ্চার অথচ বলিষ্ঠ

সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতীক রূপ এই তক্ত্ মোবারক সিংহাসনটি তার অতীত গৌরব ধরে রেখেছে।

লেখক ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে চেয়ে গল্পের তাৎপর্যকে বেশ স্পষ্টভাবে এঁকেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান শাজাহান ও তার পুত্রদের পারস্পরিক সিংহাসন দখলের লড়াই, অবিশ্বাস্য উচ্চাভিলাসী মনোভাব, অদম্য ভোগলিপ্সু বিলাস, বৈভব ও কুটিল নৃশংসতা মোঘল রাজত্বকে অনেকটাই শক্তি বিচলিত করে। ইতিহাসের সেই বিষয়টি গল্পটির প্রধান উপজীব্য। শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার সঙ্গে তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবের ভাতৃঘাতী লড়াই-এর ইতিহাসই মূল বিষয়-আশয়। এই দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি লেখক মধ্যবর্তীকালীন সুলতানদের কথাও কাহিনীর প্রয়োজনে বর্ণনা করেছেন। একনজরে শাজাহানের পরবর্তী শাসকদের নাম সারণির সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক—



(শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, তক্ত্ মোবারক গল্পে প্রাপ্ত, পৃ. ২২৫)

তক্ত্ মোবারককে ঘিরে ভাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে উঠে। তবে গল্পকার সুজার তক্ত্ মোবারকের কাহিনিটিকে বিশেষ ভাবে উপস্থাপন করে গল্পটিকে রমণীয় করে তুলেছেন। সুজা চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা, শক্তির দর্প যথাযথ রূপ পেয়েছে। গল্পের প্রথমাংশে জানা যায়— “তক্ত্ মোবারক — মঙ্গলময় সিংহাসন! কথিত আছে, এখনও গ্রীষ্মকালে এই সিংহাসনের পাষাণগাত্র বহিয়া রক্তবর্ণ স্বেদ ঝরিতে থাকে, যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হইতেছে। সেকালে মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, বাদশাহীর অতীত গৌরব গরিমা স্মরণ করিয়া তক্ত্ মোবারক শোণিতাশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু তাহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। তক্ত্ মোবারকের শোণিত ক্ষরণের ইতিকথা আরও নিগূঢ়, আরও মর্মান্তিক।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২২৪) আবার পাশাপাশি লেখক জানান — “তক্ত্ মোবারকের মতো এমন অভিশপ্ত সিংহাসন বোধ করি

পৃথিবীতে আর নাই।” (তদেব)

এই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সুজার জীবনেতিহাস পরিব্যাপ্ত। শুধু সুজার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বিরুদ্ধেই নয়, ভ্রষ্টাচার রাজশক্তির বিরুদ্ধে, অমনুষ্যত্বের শক্তিদম্বের বিরুদ্ধে রক্তমাখা সিংহাসন প্রতিবাদের প্রতীক। দানবীয় শক্তির হাতে অসহায় ভাবে জীবন-হারানো মানুষগুলো জ্বালাময়ী প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদী নজর বোখারী তার পুত্র মোবারককে খুইয়েছে, হারিয়েছে পুত্রবধুকে। মোবারকের ঘাতক, মোবারকের স্ত্রী পরীবানুর লুণ্ঠক অত্যাচারী সুজাই আবার তার ওপর (নজর বোখারী) দায়িত্ব দিয়েছে মঙ্গলময় সিংহাসন তৈরি করতে। মনের তীব্র জ্বালা, যন্ত্রণা অসহনীয় দুঃখ, পুত্রশোক, পুত্র বধুর জন্য অসহায় বাক্যালাপ তিলে তিলে তাকে তুষের আগুনের মতো পুড়িয়েছে। আর সেই ক্রোধের ফসলই হ'ল চিরকালের অভিশপ্ত সিংহাসন তক্ত মোবারক। এই সিংহাসনে বসলেই পতন সুনিশ্চিত। ফলে সুলতান সুজারও পতন ঘটে। এই সিংহাসন দখল করে কেউই রাজত্ব করতে পারে নি — সকলেই মহাকালের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গল্পটির রমণীয়তা আমাদের আকর্ষণ করে। কারণ গল্পটির কাহিনি পাঠে তা বোঝা যায়। 'তক্ত মোবারক' একটি সিংহাসনের নাম। এই সিংহাসনটি সুজার নির্দেশে অসহায়ভাবে নির্মাণ করে প্রস্তর শিল্পী নজর বোখারী। মোবারক নজর বোখারীর একমাত্র পুত্র, পুত্রবধুও রয়েছে। পরম সুখে-শান্তিতে বাস করছিল এই ছোট্ট পরিবারটি। একদিন মোবারক পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে সুলতান সুজার রোষে পড়ে। মোবারক নির্ভীক, সৎ ও স্পষ্টবাদী চরিত্র। সুজার বর্বরোচিত ও অশোভন আচরণে মোবারক ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। সুলতান সুজার অকথ্য অভব্য ব্যবহারের প্রতিবাদ গর্জে ওঠে। এছাড়াও, ভাইয়ের হাতে পরাজয়ের কথা শুনিয়া খোটা দেয়। ফলে সুজা রাগ সামলাতে না পেরে মোবারকের মাকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষা ব্যবহার করায় মোবারক হাতে থাকা ছিপ দিয়ে সুজার কপালে বারি মারে। এতে সুজা চরম রেগে গিয়ে খাপে ঢাকা তলোয়ার বের করে মোবারকের গলায় আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ মোবারকের মৃত্যু হয়। মধ্যযুগীয় বর্বরতা এতে প্রকাশিত। তাদের মানুষ কত তুচ্ছ কারো প্রাণ নিতেও মানুষের প্রাণ মূল্যহীন। এই বর্বর স্থূলতানদের কিছু যায় আসে না। সুজার চরিত্রের রূপ আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মোবারকের অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রীকে জোরপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। ক্ষমতাহীন, শক্তিহীন নজর বোখারী তার প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। সে জানে এটাই সুলতানদের রীতি তাই লোভ লালসার অন্ত নেই। বর্বরতা তাদের রক্তে। নজর বোখারী সুজাকে কি আটকাতে পারে? ফলে অসহায়ভাবে নিজের পুত্রের রক্ত দিয়ে অভিশপ্ত সিংহাসন তৈরি করেছে।

'তক্ত মোবারক' নামটি বিশেষ তাৎপর্য ও ইঙ্গিত বহন করে। নামকরণের বিষয়টিও

অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী। স্বেচ্ছাচারী সুজার তলোয়ারের আঘাতে মোবারকের অশরীরি আত্মাও সুজার এরূপ আচরণের, লালসা ও উদ্রগ্র কামনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। গল্পটির নামেই তা দ্যোতিত হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয় সুলতানী আমলের সুলতানী রীতি অনুযায়ী মুসলমান সুলতানদের ভোগলিপ্সু, প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, উদ্রগ্র কামনা-বাসনা, নারীলিপ্সু, নিষ্ঠুর ও নির্দয়রূপ ইত্যাদি এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। তবে সব সুলতানই যে কামনা-বাসনা ও নির্দয়-নিহর ছিলেন তা নয়। মধ্যযুগের প্রেক্ষিত হলেও তা হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এই গল্পটি পাঠে শরদিন্দুবাবুর ইতিহাসাশ্রিত গল্প ‘অমিতাভে’র কথা মনে পড়ে। মানব চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে সেখানে জানা যায়— “মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৬) ‘তজ্জ মোবারক’ গল্পেও সুলতান সুজা তারই উদাহরণ। কারণ অতিতুচ্ছ কারণে সে নিষ্পাপ-নির্দোষ মোবারককে হত্যা করেছে। মোবারক হত্যা, পুত্রবধূর ভাগ্য বিপর্যয়, পুত্রশোকের দ্বারা জর্জরিত নজর বোখারী চরিত্রটি অসহায়ভাবে তার কথায় সিংহাসন তৈরি করেছে।

‘অমিতাভ’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’ এবং ‘মরু ও সঙঘ’ গল্পগুলিতে বৌদ্ধ অনুষঙ্গ, বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব, বৌদ্ধ-সঙঘের জীবন-প্রণালী হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, দ্বেষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকলেও ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পটিতে বৌদ্ধ-ধর্ম ও ধর্ম-মাহাত্ম্যই প্রধান উপজীব্য বিষয়। অভিরাম ভিক্ষুর চরিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হয়েছে। আদ্যন্ত বৌদ্ধদেবের প্রকৃতরূপ কেমন ছিল সেটাই ছিল লেখকের উদ্দীষ্ট।

ভগবান বৌদ্ধের চন্দন-মূর্তিকে গল্পটির মূল কেন্দ্রে স্থাপন করে লেখক বৌদ্ধ ভিক্ষু অভিরামের বৌদ্ধ অনুরক্তের কথা প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধদেবের প্রকৃত মূর্তি কেমন ছিল— তারই সন্ধানে অভিরাম নিযুক্ত। দীর্ঘ অন্বেষণের পর তথাগতের প্রকৃত মূর্তির সন্ধান সে পায়। ভিক্ষু অভিরাম বিহারের জেতবনে ভগ্ন ইট আর পাথরের স্তূপের মধ্যে একটি শিলালিপির সন্ধান পান। প্রাপ্ত শিলালিপিতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা রয়েছে তথাগতের প্রকৃত চন্দন-মূর্তি হিমালয়ের কম্পন প্রবণ জঙঘাদেশে অসুর শ্রেণির দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্মাশোকের আমলে নির্মাণ করেছিলেন। তিন মাসের পর অভিরাম গল্পকথক বিভূতিবাবুকে সব কথা খুলে বলে ও উভয়ে চন্দন-মূর্তির দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। ভুটিয়া মোড়লের সাহায্যে পর্বত শৃঙ্গে স্থাপিত বৌদ্ধ মূর্তির কথা সবিস্তারে জানতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, সেখানে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। উপায় বলতে শুধু বহুকালের জীর্ণ লোহার সেতুটি। বাতাসের আঘাতেই তা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হতে পারে। অভিরামের প্রবল বাসনা ভগবান বৌদ্ধদেবের দর্শন লাভ। বিপদের

সমভাবনা বুঝেও সে বৌদ্ধস্তুপে পৌঁছায়। তার সঙ্গিটি কিন্তু যেতে সাহস পেলে না। কথক গেল না ঠিকই কিন্তু তারা ভেতরে ছিল অনুসন্ধান কাম মন। আর অভিরাম বৌদ্ধ-অন্তপ্রাণ। সেই টানেই অভিরাম বৌদ্ধ স্তুপে যায় এবং শৈল ভূমির স্বাভাবিক প্রবণতা ভূ-কম্পনের ফলে বৌদ্ধ স্তুপ হুড় ঘুড়িয়ে খাদে পড়েছে। কথক সেই দৃশ্য ও অবলোকন করে হতচকিত হন। তার আর খোঁজ মিলল না। পুণ্যাহুতিই তার কাম্য ছিল ফলে যে সব বাধা অতিক্রম করে বিপদের দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছে। যুগে যুগে প্রকৃত ভসরা তাই-ই করে এসেছে। অভিরাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হিমালয়ের কমান প্রবণ জগ্ঘাদেশের বর্ণনায়, বৌদ্ধ-স্তুপের চন্দন-মূর্তি ইচ্ছায়, মরচে পরা জীর্ণ লোহার শেকলের ওপর দিয়ে বৌদ্ধ-স্তুপে পৌঁছানো, স্তুপের চারিদিকে গভীর খাদ, বৌদ্ধ-ভিক্ষুর নির্বাণ লাভ ইত্যাদি দৃশ্য আমাদের মনে রোমাঞ্চ জাগায়। ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পটিও ইতিহাসাশ্রিত রোমাঞ্চ-মূলক কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মস্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

“রোমাঞ্চই আপনার কবিত্বের মূল প্রেরণা।... আপনি বাস্তবের বাস্তবতা খুঁড়িয়া দেখিতে চান না, জীবনের কোনো ব্যাখ্যা বা philosophy আপনার মনকে চাপিয়া ধরে না — সে পিপাসা আপনার নাই; অর্থাৎ আপনি Keats -এর Nightingale -এর মত ভাগ্যবান — মানবমনের বা প্রকৃতির চিরবসন্তের দেশে পলাইয়া বাঁচিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। আপনি passion ও emotion গুলিকে নিজের মতো পাক করিয়া একটু রস তৈয়ার করিয়া দেন এবং ইহার জন্য Situation, incident ও character নিজের মত করিয়া গড়িয়া লন। ইহাই আপনার বাহাদুরী।...”^{২৫}

পণ্ডিতেরা ভারতীয় সমাজে নানা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। যেমন—ক্লাসিক্যাল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর বৈরীতা ও অসহিষ্ণুতার রূপটিও লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম সংঘাত ও ধর্ম সমন্বয়ও চোখে পড়ে। বলা যায়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় পরিবর্তন অবশ্যস্বত্বী। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে তা জানা যায়। পরধর্ম সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, পরধর্ম সম্বন্ধে ঘৃণা ও ধর্মান্তরনের প্রবণতা অতীতযুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও ধর্মান্তরের বিষয়টিও দেখা দিয়েছে। স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ অর্থের লোভ কিংবা সামাজিক উৎকর্ষতার লোভ দেখিয়ে আদিবাসী (সাঁওতাল ইত্যাদি) সমাজের নিরক্ষর গরীব মানুষদের হোম-যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে ধর্মান্তরিত করেছেন। এই প্রক্রিয়ার যে শেষ নেই সে কথাই গল্পকার বলতে চেয়েছেন। ধর্মীয় বিদ্বেষ আজও বিদ্যমান। ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে পীড়ন সমাজকে আজও অস্থির করে তুলছে। কিছু মানুষ চেপ্টা করছেন এসবের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। কিছু মানুষ চেপ্টা করছেন এসবের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। লেখনির মাধ্যমে চালানো হচ্ছে প্রচার।

সাম্প্রদায়িকতার রেশ আজও ভারতীয় সমাজকে বিচলিত করে তুলছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্প্রীতি ও সন্ততির রূপটি কাম্য। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য উদাহরণ।

নির্দেশিকা :

১. শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১০
২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮
৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৫
৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৬
৫. নিতাই বসু, সত্যাশ্বেষী শরদিন্দু, পৃ. ৪৯
৬. নিতাই বসু, সত্যাশ্বেষী শরদিন্দু, পৃ. ৪৯
৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, গল্প পরিচয়, পৃ. ৪২৮
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, গল্পপরিচয়, পৃ. ৪২৪
৯. প্রভাতাংশু মাইতি, স্টাডিস্ ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩৯১
১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, গল্প পরিচয়, পৃ. ৪২৪
১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, ভূমিকা, পৃ. ১১
১২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৪২৬
১৩. তদেব, গল্প-পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৮
১৪. তদেব, গল্প-পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৭
১৫. তদেব, গল্প পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৭
১৬. তদেব, গল্প পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৭-৪২৮
১৭. তদেব, গল্প-পরিচয় অংশ, পৃ. ৪২৪
১৮. তদেব, পৃ. ৪২৮
১৯. তদেব, পৃ. ৪২৪
২০. তদেব, পৃ. ৪২৭
২১. তদেব, পৃ. ৪২৫
২২. তদেব, পৃ. ৪২৭
২৩. তদেব, পৃ. ৪২৬
২৪. তদেব, পৃ. ৪২৫
২৫. তদেব, পৃ. ৪২৬